Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাম্মৎ উম্মে হুমেয়ারা সুমী

রোলঃ 227021304

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাম্মৎ উম্মে হুমেয়ারা সুমী

রোলঃ 227021304

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসাম্মৎ উম্মে হুমেয়ারা সুমী, আইডিঃ 227021304বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোসাম্মৎ উম্মে হুমেয়ারা সুমী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোসাম্মৎ উম্মে হুমেয়ারা সুমী

আইডিঃ 227021304

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله والصلوة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد....

ধর্মীয় বিভাজন মানবজাতির ইতিহাসে একটি প্রাচীন সমস্যা, যা সমাজে বিদ্বেষ ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে। ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও সাম্যবাদী ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বহু যুগ ধরে একে ঘিরে নানা ধরনের অপতৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এই অপতৎপরতা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছিল। মক্কার কুরাইশরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত তাওহিদের (ঈশ্বরের একত্ববাদ) বার্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। নবী করীম(সা.)এর মদিনা হিজরতের পরও তারা মুসলিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার চেষ্টায় একাধিক যুদ্ধ শুরু করে, যেমন বদর, উহুদ, এবং খন্দকের যুদ্ধ।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামি খেলাফতের বিস্তার রোধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ষড়যন্ত্র এবং ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর সময় খ্রিস্টানদের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারও ধর্মীয় বিভাজনকে আরও তীব্র করে তোলে। এসব ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ ঐক্য নষ্ট করার পাশাপাশি ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে আঘাত করা হয়েছে।তারা চায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করতে এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দিতে। তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

আহলে কিতাবীদের(ইহুদি ও খ্রিস্টান) মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্যে বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।—আল বাকারা - ১০৫

ইসলামের প্রধান শত্রুদের অন্যতম হলো মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান জাতি। ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চলেছে। বরং তারা

মুসলিম দেশে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুর্বল অবস্থাসমূহকে পুজি কের অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিমদের আকিদা বিশ্বাসকে দুর্বল করা এবং দ্বীন ইসলামের প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া,এসবের মাধ্যমে তারা মুসলিম থেকে বিচ্ছিন্ন করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত।তাদের এসব দুঃস্বপ্ন কে বাস্তবায়নের লক্ষে অজস্র অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের অবস্থা তো ঐরূপ যেমন আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ لِيَصُدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ؕ فَسَيُنۡفِقُوۡنَهَا ثُمَّ تَكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةً ثُمَّ يُغۡلَبُوۡنَ ؕ‌ۙ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحۡشَرُوۡنَ ۙ

আল্লাহ্ র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্যে কাফিররা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; তারপর এটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে; এর পর তারা পরাভূত হবে আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।

—আল আনফাল - ৩৬

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন এবং হিজাব বা ইসলামি পোশাক নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত করছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রোপাগান্ডা যুদ্ধও চলছে। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং বিভক্তি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে দুর্বল করে ফেলেছে।

একদিকে ইসলামের শিক্ষা হলো অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সুবিচার করা, অন্যদিকে মুসলিম সমাজকে তার নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হয়। এই দ্বৈত দায়িত্ব কীভাবে পালন করা যায়, তা এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং ধর্মীয় চেতনা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একদিকে নিজেদের আদর্শ ধরে রাখতে পারে, অন্যদিকে অমুসলিমদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

এই গবেষণায় আমরা অমুসলিমদের অপতৎপরতার সংজ্ঞা, এর পেছনের কারণ এবং ইসলামের আলোকে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত তা বিশ্লেষণ করব। একই

সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিমালা তৈরি করা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি, এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইহুদি জাতি

নুহ(আঃ) এর পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তার বংশ থেকে দুটি বড় শাখা বেরিয়েছে। একটি হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর যারা আরবে বসবাস করে। দ্বিতীয়টি হযরত ঈসহাক (আঃ) এর বংশধর যার মাঝে হযরত ইয়াকুব (আঃ),হযরত ইউসুফ(আঃ),
হযরত মুসা(আঃ), হযরত দাউদ(আঃ), হযরত সুলাইমান(আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ),হযরত ঈসা(আঃ) ছাড়াও আরও অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেছেন।
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের হিব্রু উপাধি ছিল ইসরাইল। যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। তাই তার সন্তানদেরকে বনি ইসরাইল বলা হয়। বনি ইসরাইল একটি বংশীয় নাম। ধর্মীয় দিক থেকে এদেরকে ইহুদী বা আহলে কিতাব বলা হয়। এই ইসরাঈল তথ্য ইহুদীরা নিজেদের বংশীয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত কঠোরভাবে। রাখতো। এমনকি কোন ইহুদী নারীর ঐ সন্তান যা অন্য কোন ধর্মাবলী থেকে হয়েছে বা কোন ইহুদী পুরুষের ঐ সন্তান যা অন্য কোন ধর্মাবলবীর থেকে জন্ম নিয়েছে সেও ইহুদী হতে পারতো না। অন্য কোন বংশীয় লোন নারী হোক বা বা পুরুষ, নিজেকে ইহুদী বলতে পারতো না। হ্যাঁ তার স শুধু এতটুকু বলা হতো যে, সে ইয়াহুদ ধর্মের অনুসারী। অন্যভাবে বলতে আসলে ইয়াহুদ ধর্মটি একটি বংশীয় ধর্ম। প্রচারিত কোন ধর্ম নয়। এ ইহুদী নয় এমন কোন ব্যক্তিকে ইহুদী বানানোর কোন পদ্ধতি তাদের ধর্মে তা তবে আরবের কিছু গোত্র এমন ছিলো যারা জন্মসূত্রে ও বংশীয় ভালে । ইসরাঈলী ছিলো না বরং ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর ছিল। কিন্তু ই সংস্পর্শে থেকে এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা ও বংশীয় সুখ্যাতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তারা প্রথমে ইহুদীদের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এর পরে ধীরে ধীরে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও নিজেদের মাঝে ধারণ করেছে। এক

পর্যায়ে ইয়াহুদী আদম শুমারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অবশেষে তারা তাদের স্বকীয়তাও হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা বংশীয় দিক থেকে ভিন্ন হলেও ধর্মীয় দিক থেকে তাদের পরিপূর্ণ অনুসারী হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী ইতিহাসের প্রথম পর্ব

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর উপাধি ছিল ইসরাঈল, এজন্য তাঁর সন্তানদেরকে "বনী ইসরাঈল" বলা হয়। ইয়াকুব (আঃ) এর মোট ১২ জন সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেই সন্তান লাভ করেছিল এবং তাদের ১২ জন থেকে ১২টি ভাদ্রের সূচনা হয়েছিল, ফলে বণী ইসরাঈল ১২টি গোত্রে বিভক্ত হয়েছিল। ইয়াকুব (আঃ) এর উল্লেখিত ১২ জন সন্তানের বড় দশজন তার প্রথম স্ত্রী হযরত লায়া বিনতে লাইয়ান থেকে জন্মলাভ করেন। তার মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আঃ) প্রথম স্ত্রীর সহদরা "রাহীল" কে বিয়ে করেন।

তার থেকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দুই পুত্র সন্তান ইউসূফ ও বিন ইয়ামীনের জন্ম হয় (কুরতুবী)।

ভাইদের এক ষড়যন্ত্র হযরত ইউসূফ (আঃ) কে আগেই মিসরে পৌঁছে দিয়েছিলো এবং এক দীর্ঘ সময় পর (যেমন কুরআনে এসেছে وكذلك مكنا

ليوسف আমি ইউসূফকে জমীনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলাম) মিশরের শাসন ক্ষমতা অর্জন হয়েছিল। তখন তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনসহ মিশরে আগমন করেন। যাদের সংখ্যা নারী পুরুষসহ এক বর্ণনা অনুযায়ী ৭২ জন, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ৯৩ জন ছিল। আল্লাহ তাআলা মিশরে বনী ইসরাঈলদেরকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন, তাদেরকে জনবল ও দলবলে বলীয়ান করেছিলেন। হযরত মুকাতেল (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ)

এর যুগ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ছয় লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। হযরত ইউসূফ (আঃ) এর যুগ ও তারপরেও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিশরে তাদের প্রবল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। তারাই তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। তারপর সাধারণ মানুষের প্রতি বনী ইসরাঈলের অত্যাধিক অবহেলা ও যুলুমের ফলে জনসাধারণ তাদের বিপক্ষে চলে গেলো, এমনকি মিশরীগণ এক পর্যায়ে তাদের উপর জয়ী হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিল ও গোলামে পরিণত করলো। এখন তারা বনী ইসরাঈলদের প্রতিই কঠোরতা প্রদর্শন করে তাদের দিয়ে কষ্টকর কার্যাবলী সম্পাদন করতে লাগল। এক পর্যায়ে মূসা (আঃ) এর জন্মের পূর্বে মিশরের বাদশাহ ফিরাউন বনী ইসরাঈলদের নবজাত ছেলেদেরকে হত্যা করার আর মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ জারি করে। এভাবেই কয়েক শত বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈল ফেরাউনীদের গোলাম হয়ে জীবন যাপন করে এবং কিবতীদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে বনী ইসরাঈলের "লাভী" নামক গোত্রে হযরত মূসা (আঃ) এর জন্মলাভ হয়। তিনি ফিরাউনের লালন-পালনে বড় হন। আল্লাহ তাআলা তাকে নবুওয়াত দান করেন এবং তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের যুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দান করেন। এরপর থেকে হযরত মুসা (আঃ) ও তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল পুনরায় মিশরের শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। আর কারও কারও মতে তারা মিশরের কোন এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবনযাপন শুরু করেন। বিষয়টি কুরআন কারীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

واذ نجينكم من آل فرعون

স্মরণ কর যে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউন সম্প্রদায় থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতো। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করতো এবং তোমাদের কন্যাদেরকে অব্যাহতি দিতো। বস্তুত: তাতে ছিল মহাপরীক্ষা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে।

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম অতপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফিরাউনের লোকদিগকে, তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

(সূরা বাকারা ৫০-৫১)

যখন ফিরাউনের মৃত্যু হলো এবং বনী ইসরাঈলগণ নিরাপদ হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের স্বদেশ সিরিয়া (যা আমালিকা সম্প্রদায় দখল করে রেখেছিল) জয় করার জন্য জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে এই সুসংবাদও জানিয়ে দিলেন যে, উক্ত যুদ্ধে বনী ইসরাঈলদেরই বিজয় লাভ হবে এবং সিরিয়ার ভূমি তাদের করতলগত হবে। বনী ইসরাঈল জিহাদের উদ্দেশ্যে তাদের আবাসস্থল ছেড়ে অগ্রসর হলো।

কিন্তু সিরিয়ার নিকটে পৌঁছে আমালিকার শক্তি সামর্থের বর্ণনা শুনে নিজেদের সাহস হারিয়ে ফেললো। নিজেদের স্বভাবগত বৈশিষ্টের কারণে আল্লাহ তাআলার অনেক নেয়ামতরাজী নিজ চোখে অবলোকন করার পরও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণে তারা অপারগ হলো, আল্লাহর বিধান সিরিয়ার জিহাদ করার পরিবর্তে তারা গোঁ ধরে বসে রইলো।

তাদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি, ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইয়াওকনা, যারা মূসা (আঃ) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছিল, তারাও মূসা (আঃ) এর সাথে সম্প্রদায়কে বোঝানোর চেষ্টা করলো। তারা সম্প্রদায়কে বললোঃ তোমরা শুধু বাইতুল মাকদাস শহরের দরজা পর্যন্ত চলো, দেখবে এতেই ইনশাআল্লাহ আমাদের বিজয় অর্জন হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল তাদের হঠধর্মী ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে বসে থাকলো এবং মুসা (আঃ) কে সাফ জানিয়ে দিলো।

اذهب انت وربك فقاتلا

হে মুসা! আমরা কিছুতেই সেখানে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে, অতএব তুমি এবং তোমার রব গিয়ে তাদের সাথে লড়াই কর। আমরা এখানে বসে আছি।
(সূরা মায়েদাহ, আয়াত-২৪)

এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলো, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো তখন তিনি শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে "তীহ" ময়দানে নষর বন্দী করে রাখলেন। ছয় লাখ মানুষকে আল্লাহ তাআলা সেই ময়দানে এভাবে বন্দী করে রাখলেন যে, তারা কোনভাবেই সেখান থেকে বের হয়ে মিশরে কিংবা বাইতুল মাকদাসের দিকে যেতে পারছিল না, তারা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন কোন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলতে থাকতো কিন্তু বিকেলে দেখতে পেতো, সারাদিন পর তারা সকালের ছেড়ে যাওয়া স্থানেই ফিরে এসেছে।

এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মূসা (আঃ) তাদেরকে পুনরায় বুঝালেন, আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা মূনা (আঃ) এর কথায় কর্ণপাত করলোনা। গোঁ ধরে বসে থেকে আগের মতই উত্তর দিলো।(যা সূরা মায়েদাহ এর ২০-২৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)
"তীহ" ময়দানের এই চল্লিশ বছর ছিল ইহুদীদের জন্য এক অভিশপ্ত ও লাঞ্ছনাকর সময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তার দুই প্রিয়নবী হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) এবং তার দুই মাককূল বান্দা হযরত ইউশা ও কালিব (রঃ) এর উসিলায় ইহুদীদেরকে অনেক নেয়ামত দান করেছিলেন। যেমন তারা রৌদ্রের অভিযোগ করলে মূসা (আঃ) এর দু'আয় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিশাল একখন্ড মেঘমালা দিয়ে ছায়া দান করেন। ক্ষুধার চাহিদা মিটানোর জন্য মান্না এবং সালওয়া তথা এক প্রকার হালুয়া ও পাখির গোস্তের ব্যবস্থা করে দেন, পানির সমস্যা নিরসনের জন্য আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ) কে একটি পাথরে আঘাত করার নির্দেশ দেন। ফলে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ নির্গত হয়। তারা রাত্রের অন্ধকারের অভিযোগ করেছিল। আল্লাহ তাআলা স্তম্ভের মত লম্বা এক কুদরতী আলোকবর্তীকা দ্বারা তাদের অন্ধকার দূর করে দিয়েছিলেন। শুরুতে তাদের পোষাকগুলো ময়লা হচ্ছিলো তখন আল্লাহ তাআলা তার এই কুদরতি বিধান জারি করলেন যে, তাদের কাপড় আর ময়লা হচ্ছিল না। ছিড়েও যাচ্ছিল না বরং মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে পোষাকগুলোও বড় হচ্ছিল।
(তাফসীরে কুরতুবী)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখিত নেয়ামতগুলোর বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে দিয়েছেন,

وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوي

অর্থাৎ আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদেরকে ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া (এক প্রকার হালুয়া ও পাখির গোশত) প্রেরণ করেছি।
(সূরা বাকারা, আয়াত-৬৯)

واذا استسقي موسي لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر

অর্থ: "যখন মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো তখন আমি নির্দেশ দিলাম, তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে পাথর থেকে বারটি নির্ঝরণী প্রবাহিত হলো। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার পান করার স্থান চিনে নিলো। আমি নির্দেশ দিলাম- তোমরা আল্লাহর রিযিক ভক্ষণ কর ও পান কর, জমিনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফিরোনা"। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী "তীহ" ময়দানের সেই চল্লিশ বছরের মধ্যেই প্রথমে হযরত হারুন (আঃ) এর ইন্তিকাল হল, তাঁর ছয়মাস কিংবা একবছর পর হযরত মূসা (আঃ) এর ইন্তিকাল হয়। তাদের পর বনী ইসরাঈলকে হিদায়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা ইউশা ইবনে নূনকে নবুওয়াত দান করেন। তীহ ময়দানের চল্লিশ বছর শেষ হয়। অবশিষ্ট ইহুদীদেরকে নিয়ে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বাইতুল মাকদাসে রওনা হন। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে সিরিয়ার বিজয় দান করেন এবং তাদেরকে দান করেন সিরিয়ার অঢেল সম্পদ। (মাআরেফুল কুরআন ১ঃ১৭৪-১৮০ পৃঃ)

ইহুদি ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব

সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৪-৮) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদী ইতিহাসের এ পর্বটির সূচনা হলো হযরত ইউশা (আঃ) থেকে। হযরত মুসা (আঃ) এর ইন্তিকালের পর তিনি ইহুদীদেরকে নিয়ে জিহাদের জন্য বাইতুল মাকদাসের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাদের হাতে বাইতুল চাকদাসের বিজয় অর্জন হলে তারা বাইতুল মাকদাসে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করা শুরু করে। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের নিকট তাদের প্রবেশ ছিল

গোলযোগপূর্ণ, অহংকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের মত, তাতে খোদাতাআলার প্রতি বিনয় কিংবা নম্রতার লেশমাত্র ছিলো না (যেমন নম্রতার প্রতিফলন ঘটেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কা বিজয়ের ঘটনায়) অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নম্রতার সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় প্রবেশ করার জন্য। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

"স্মরণ কর! যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা-স্বাচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর এবং বলোঃ ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্ম পরায়নদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো।"

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে হযরত ইউশা (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহুদীদের সংশোধনে লেগেছিলেন। তাদের ঝগড়া-ঝাটি ও মামলা মোকাদ্দমা নিরসনের জন্য তিনি অনেক বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরও ইহুদীরা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে পারে। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী একথাও জানা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পর্যন্ত তাদের মাঝে বিচারকদের সেই বিচারের নীতি অব্যাহত ছিল। বিচারকগণ তাদের গোত্র সমূহের নেতৃত্ব এবং তাদের মামলা সমূহের ফায়সালা করতেন। এসময়ে তাদের মাঝে হযরত হিযকীল, হযরত ইলয়াস, হযরত ইয়াসাআ আঃ

আরও অনেক নবীগণের আগমন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত ইউন (আঃ) এর পর হযরত হিযকীল (আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কুরআনের কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ নেই। হ্যাঁ তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন ঘটনায় তার নাম এসেছে। তবে তাঁর সমকালীন হযরত ইলয়াস (আঃ) এর কথা সূরা আনআম ও সূরা সফফাতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ হযরত ইয়াসা (আঃ) এর আলোচনাও সূরা আনআম ও সূরা হুদে এসেছে। তাদের পর হযরত শামী নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন।

মোটকথা হযরত ইউশা (আঃ) এর পর আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। নেআমত দান করেছেন। তাদের মাঝে নবী ও রাসূলগণের আগমনের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

ولقد اتينا موسي الكتاب وقفينا من بعده بالرسل নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপর পর্যায়ক্রমে রসূলগণরে প্রেরণ করেছি। মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট মু'জিযা দিয়েছি। (বাকারা ৮৭)

কিন্তু যখন ন্যায়ের বদলে অসৎ চরিত্র, ফেৎনা ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার। খুন খারাবী কোন সম্প্রদায়ের স্বভাব বনে যায়, গোটা সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত। হয়, তখন তাদের থেকে হজ্ব গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতাও হরণ করে নেওয়া হয়। ইহুদীদের অবস্থাও তাই দাঁড়িয়েছিল। যখন নবীগণ তাদেরকে হরে। দাওয়াত দিতে এসেছেন তখন তারা দাওয়াত থেকে শুধু মুখই ফিরিয়ে নেয়নি বরং হবু বলার কারণে তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছে। অবাধ্যতা ও শিরর নিজেদের মৌলিক কাজ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলাও তাদের অহংকার, ঔদ্ধত্ত ও অন্যায়ের কারণে আখেরাতের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাদেরকে শাড়ি দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কপালে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের অভিশাপ এঁটে দিয়েছেন যাতে তারা আপন চোখে দেখে নেয় এবং দুনিয়াবাসী এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, প্রকৃত সফলতা ও কল্যাণ একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করার মাঝে আর অবাধ্য ও সীমালংঘনকারীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া কিছু নেই।

বাইতুল মাকদাসে প্রবেশকালেও তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে حطة (তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) এই ইসতিগফার করতে করতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে حبة في شعرة গমের খোশায় চাই দানা" বলে প্রবেশ করেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আকাশ থেকে গজব নাজিল করলেন। ফলে কোন কোন বর্ণনা মতে তৎক্ষণাৎ তাদের সত্তর হাজার ইহুদী সেখানেই মরে গিয়েছিল।

(কুরতুবী ১:১৭৭ পৃঃ মাআরিফুল কুরআন)

বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

(বাকারা ৫৯ আয়াত)

অর্থ: কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বললো। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আকাশ থেকে আমি শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ, তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। অতপর যখন তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে প্রত্যেক গোত্র বিভিন্ন ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সবাই একত্রে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে নিজেদের বিজীত এলাকা নিয়ে প্রত্যেক গোত্রই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। মনচাহি জীবন যাপন শুরু করে, ফলে তারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে অসৎ চরিত্র ও শিরক, বিদআত পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠে। যেমন বাইবেলের বিচার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে "বনী ইসরাঈলদের

পিতৃপুরুষগণ মিসরে যে খোদা তাআলার ইবাদত করতো ফিলিস্তি নে এসে তারা সেই খোদার ইবাদত বর্জন করে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় নতুন উপাস্য গ্রহণ করে। তারা 'বা'ল' এবং 'আছছাতারাত' এর উপাসনা শুরু করে, ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়। আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শত্রুর সম্মুখীন করেন। যারা তাদের ধন সম্পদ লুট করতো, তাদেরকে শাস্তি দিতো, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন শক্তি তখন ইহুদীদের ছিলনা। এর পর

তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে"।

(বাইবেল, দ্বিতীয় অধ্যায় আয়াত ১১-১৫)

দ্বিতীয় যে কর্মফলটি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে, তা হলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে শহরের যে এলাকাগুলোর নেতৃত্ব তারা গ্রহণ করতে পারেনি তারা ঐ সমস্ত এলাকার লোকদের সাথে হাত মেলালো যে সব এলাকা ইহুদীরা তখনও জয় করতে পারে নাই। এভাবে তারা একটা বড় শক্তিতে পরিণত হলো। ধীরে ধীরে আক্রমণ চালিয়ে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করে ফিলিস্তিনে এক বড় অংশ তারা পুনরায় দখল করে নিলো। এভাবে আমালেকার কুফুরী শক্তি দ্বিতীয়বার তাদের ঘাড়ে চেপে বসলো। তারা ইহুদীদের থেকে সেই মহামূল্যবান সিন্দুকটিও ছিনিয়ে নিলো যাতে হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর ব্যবহৃত বরকতপূর্ণ বিভিন্ন জিনিস, তাওরাতের আয়াত লিখিত তখতির ভাঙ্গা টুকরো ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবান জিনিসপত্র ছিলো। ইহুদীরা সিন্দুকটিকে তাদের কেবলার মর্যাদা দিতো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সামনে রাখতো। বাইবেলের কিতাব সামবীলে তার বর্ণনা এভাবে এসেছে- বনী ইসরাঈল লড়াইয়ে পরাজিত হলো। তাদের বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করল বাকিরা ময়দান ছেড়ে পালালো এবং সেখানে বিরাট এক রক্তের বন্যা বয়ে গেল কারণ ত্রিশ হাজার ইসরাইলি নিহত হয়েছিল এবং তাদের খোদাই সিন্দুক লুট হয়েছিল।

(সামবিল, অধ্যায় ৪, আয়াত ১০ থেকে ১১)

আমালেকাদের তৎকালীন শাসক জালুত বনী ইসরাইলের উপর অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। বনি ইসরাঈলের ধর্মীয় উন্নয়ন ও সংস্কার মূলক নিবেদিত প্রাণ হযরত সামবীল (আঃ) আল্লাহর কাছে দূআা দোয়া করে বেনিয়ামিনের বংশোদ্ভূত হযরত তালুতকে তাদের বাদশাহ বানালেনঅবশ্যই তোমাদের জন্য তাতে নিদর্শন রয়েছে।

অতপর তালুত যখন সৈন্য বাহিনীসহ বের হল সে তখন বললো, আল্লাহ এক নাদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত হবে

না, আর যে পান করবে না সে আমার দলভুক্ত হবে। এছাড়া যে তা থেকে অঞ্জলী পরিমাণ পান করবে সেও (দলভুক্ত হবে)। অতপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা তা থেকে পান করলো। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন নদী অতিক্রম করলো তখন তারা বললো "জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই"। কিন্তু যাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বললো, "আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে!" আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। তারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করেন, আমাদের পা অবিচল রাখেন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করেন।

অতপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করলো, দাউদ জালূতকে সংহার করলো। আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছা তা তিনি তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহজগতসমূহেরপ্রতিঅনুগ্রহশীল।
(সূরা বাকারা ২৪৬-৫১)
হযরত তালুতের যুগে সেই সিন্দুকটি পুনরায় বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়েছিল। যুদ্ধের পর তালুত দাউদ (আঃ) কে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ (আঃ) নবুওয়াত ও বাদশাহী প্রাপ্ত হন। কুরআনে এ বিষয়টি ষোল স্থানে আলোচনা করা হয়েছে, যার মাঝে পূর্বে বর্ণিত আয়াতটিও রয়েছে। আল্লাহ তাকে হেকমত ও বাদশাহী দান করেছেন এবং নিজ মর্জি মোতাবেক ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত দাউদ (আঃ) এর পর তার পুত্র সুলাইমান (আঃ) বাদশাহ হন এবং নবুওয়াত লাভ করেন।
স্মরণ রাখার বিষয় যে, হযরত তালুতের যুগ থেকে বনী ইস শুরু হয় এবং তা পূর্ণতা লাভ করে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর যুগে। এই বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত তালুত বিন কাশ বনী ইসরাঈলের সর্ব প্রথম বাদশাহ ছিলেন।এরপর দাউদ(আঃ)দ্বিতীয় বাদশাহ হলেন।
সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তার এই বিশাল রাজত্ব মূলত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর অংশের নাম ছিল ইসরাইল (Israil) আর দক্ষিণ অংশের নাম ছিল জুডাহ (Judah), আরবিতে যার নাম হচ্ছে ইয়াহূদ। ইসরাইল কে ছিলেন তা তো

আমরা জানি, কিন্তু জুডাহ কে? তিনি ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন ছেলের একজন। তার বংশের লোকেরা এই গোত্রভুক্ত ছিল। দাউদ আলাইহিস সালামও ছিলেন এই গোত্রের।

১২ জন ছেলের নাম থেকে উদ্ভুত ১২ টি গোত্র। এই বারটি গোত্র দুটি ভাগে ছিল। দশটি গোত্র বনী ইসরাঈল আর দুটি গোত্র মিলে হয়েছিল জুডাহ রাজ্য। আছেলের নাম থেকে উদ্ভূত ১২টি গোত্রের মাঝে একটি ছিল জুডাহ। আসিরীয়রা যখন ইসরাইল রাজ্যটা ধ্বংস করে দিয়েছিল, তারপর থেকে দশটি গোত্রের নাম-নিশানাই আর পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট ছিল কেবল জুডাহ রাজ্য যা ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের শিকার হয় ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বে এবং অধিকাংশ বনি ইসরাইলের লোকদের ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয় দাস হিসেবে। এই নির্বাসনের ঘটনার পর থেকেই মূলত পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

হিব্রু ভাষা অনুযায়ী ইসরাইল শব্দের অর্থ আরবিতে আব্দুল্লাহ শব্দের মতো, যার অর্থ আল্লাহর দাস। ইতঃপূর্বে 'বনি ইসরাইল' এই শব্দ চয়নের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ফুটে উঠত; কিন্তু যখন থেকে তারা নিজেদের ইহুদি হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করল, তখন থেকে তা ছিল একটা জাতিগত বা গোত্রীয় পরিচয়। এই পরিবর্তন শুধু নামে ছিল না, এটা ছিল ইহুদিদের মন-মানসিকতা, জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিও আচার ব্যবহারে পরিবর্তন। বনি ইসরাইলীয় হিসেবে আল্লাহ ওদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে তারা সেটার প্রতিও উদাসীনতা দেখানো শুরু করল।

বিস্ময়করভাবে কুরআন এই বিষয়টাকে তার অসামান্য ভাষাশৈলী দিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছে। আমরা যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখব আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'ইহুদি' শব্দটা মদিনার ইহুদিদের প্রসঙ্গে অথবা ইহুদি-নাসারা এভাবে একসাথে ব্যবহার করেছেন, (নাসারা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা)। কখনোই মুসা আলাইহিস সালাম বা দাউদ আলাইহিস সালামের সময়ের কোনো ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে নয়। তখন বনি ইসরাইল বলেছেন! শব্দ চয়নের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি কুরআন ধারণ করেছে অবিশ্বাস্য নির্ভুলতায়।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে কুরআন যখনই ইহুদি টার্মটা ব্যবহার করেছে, তখনই তাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। যেমন

قُلۡ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ ہَادُوۡۤا اِنۡ زَعَمۡتُمۡ اَنَّکُمۡ اَوۡلِیَآءُ لِلّٰہِ مِنۡ دُوۡنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الۡمَوۡتَ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ۝

বল, ‘হে ইয়াহূদীরা! যদি তোমরা মনে কর তোমরাই আল্লাহ্ র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয় ; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’

—আল জুমুআহ - ৬

কুরআনে ইহুদীদের বর্ণনা

কুরআনের কারীমে বনী ইসরাঈল এর ঘটনা যতটুকু বর্ণিত হয়েছে এর দ্বারা এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বনী ইসরাঈল দুনিয়াতে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। আল্লাহ আসমানী কিতাব পাঠানোর এবং তাওহীদের বাণী প্রচার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যর্পণের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের লোকদের যে বিশাল সম্মান এবং অনুগ্রহ দান করেছিলেন, সেটাকে তারা একটি জাতিসত্তা তথা পৈত্রিক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। তারা এটাকে জন্ম পরিচয় অর্থাৎ গোত্রের নামের সাথে জুড়ে দিয়েছিল- ইহুদি! তারা মনে করত এবং আজও মনে করে তারা আল্লাহর কর্তৃক মনোনীত জাতি(chosen people)।

আল্লাহতালা তাদের উপর সে অনুগ্রহ ও দানের কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন নিচে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো।

১.

یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتِیَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ وَاَوۡفُوۡا بِعَہۡدِیۡۤ اُوۡفِ بِعَہۡدِکُمۡ ۚ وَاِیَّایَ فَارۡہَبُوۡنِ ۝

হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নি‘আমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে আমার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর তোমরা (অন্য কাউকে নয়;বরং)কেবল আমাকেই ভয় করো। —আল বাকারা - ৪০

২.

وَاذۡکُرُوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ وَمِیۡثَاقَہُ الَّذِیۡ وَاثَقَکُمۡ بِہٖۤ ۙ اِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ۝

স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ র অনুগ্রহ এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা। যখন তোমরা বলেছিলে, ‘শুনলাম ও মান্য করলাম’ এবং

আল্লাহ্কে ভয় কর ; অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তো সবিশেষ অবহিত। —আল মায়িদাহ - ৭

৩.

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۟ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে। সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতেছে যাতে তোমরা বলিতে না পার, ‘কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসে নাই।’ এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। —আল মায়িদাহ - ১৯

৪.

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ

আমি তো জেনে-শুনেই এদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম,—আদ-দুখান - ৩২

৫.

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হে ইসরাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি আর তোমাদেরকে বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।—আল বাকারা - ৪৭,১২২

কুরআনে কারিমের উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝানো যায় যে বনী ইসরাঈল জন্মসূত্র অভিশপ্ত ছিল না বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্মানীয় অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।স্বয়ং কোরআন শরীফে এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে বংশগত কারণে প্রদান করা হয়নি বরং তাদের সেই ফজিলত বংশগত কারণে প্রদান করা হয়নি বরংপ্রদান করা হয়েছিল আল্লাহতালা কর্তৃক এক ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার শর্তে।

অহংকারী ও অভিশপ্ত জাতি

অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা কেবল নিজ অনুগ্রহ ওঅনুকম্পায় যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন তারা তা নিজেদের যোগ্যতা অধিকারের তেলেসমাতি এবং

এক প্রাকৃতিক পাওনা বলে মনে করেছিল। তারা মনে করেছিল আমরা আল্লাহতালা প্রিয় ও মাকবুল বান্দা। তাদের মধ্যে বাদশাহী ও নবীজাদের অহংকার ঢুকে পড়েছিল। যার কারণে তারা পথভ্রষ্টতা নিপতিত হয়েছে এবং এ সম্প্রদায় তাওহীদ ও একত্বের আস্তিন ছেড়ে শিরক ও বহুত্বের আস্তাকুঁড়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা নিঃশর্ত ছিল না বরং শর্ত যুক্ত ছিল। যখনই তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেছে তখন আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন করেছি তখনই সেখান থেকে তাদের বিতারিত করেছেন। ইহুদীরা নিজেরাও জানত যে তাওরাতের কোথাও নিঃশর্ত পরিত্রাণের কথা উল্লেখ নেই। আল্লাহতালা কখনো তাদের অঢেল ধন দৌলত, আরাম আয়েশার জীবন উপকরণ দিয়েছিলেন যাতে তারা অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কখনো তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননা চাপিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ বিপর্যয় ফেলেছেন যাতে তারা নিজেদের মন্দ কার্যাবলী থেকে তওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে কিন্তু এই অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল এমন সকল অবস্থা থেকে শিক্ষা লাভ করার পরিবর্তে নিজেদের অবাধ্যতায় আরো মেতে উঠেছে। নিজেদের অযোগ্যতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহতালার অভিশম্পাতে পড়েছে। ইহুদীদের এই লাঞ্ছনার ধারা ধীরে ধীরে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে যাতে কিয়ামত অবধি আগত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।কুরআনে কারিমের কয়েক স্থানে ইহুদিদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলো এ ব্যাপারে অন্যতম

১.

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ * وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ٪

যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মূসা! আমরা একইরকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না; সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর-তিনি যেন ভ‚মিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্যে উৎপাদন করেন।’ মূসা বলল, ‘তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও নিশ্চয়ই তা সেখানে আছে।’

তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল আর তারা আল্লাহ্ র ক্রোধের পাত্র হল। এটা এইজন্যে যে, তারা আল্লাহ্ র আয়াতকে অস্বীকার করত আর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্যেই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল।—আল বাকারা - ৬১

২.

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ ۖ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۖ

এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছিল আর আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।—আন নিসা - ৫২

৩.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ * ◌َ

আল্লাহ্ র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গিয়েছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্ র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত আর অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত; এটা এইজন্যে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল আর সীমালংঘন করত।—আলে ইমরান - ১১২

৩.

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۖ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে আমি তাদেরকে লা'নত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি ; তারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল এর এক অংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা এদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে, সুতরাং এদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

—আল মায়িদাহ - ১৩

৩.

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ◌َ

বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়াম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল-এটা একারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

—আল মায়িদাহ - ৭৮

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস

তৎকালীন ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে মেনে নেয় তারা মারিয়ামের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটনাে অব্যাহত রাখে।স্বয়ং খৃষ্টানরা ব্যাপারটা ব্যাপারটাকে এতটাই অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করেছে যে তারা তাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে,

اِنَّ مَثَلَ عِيۡسٰى عِنۡدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ‌ؕ خَلَقَهٗ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ ۝

আল্লাহ্ র নিকট নিশ্চয়ই ‘ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন; এরপর ওটাকে বললেন ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল। —আলে ইমরান - ৫৯

খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর পুত্র হিসেবে উপাসনা করত। ত্রিত্ববাদ বা তিন খোদায় বিশ্বাস খ্রিস্ট ধর্মের একটি বুনিয়াদি আকিদা ও মৌলিক বিশ্বাস। ত্রিত্ববাদ বলে খ্রিস্টান পাদ্রীগণ বুঝাতে চান তা হলো পিতা প্রভু, পুত্র প্রভু এবং রুহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা) প্রভু। অর্থাৎ তিনে মিলে এক প্রভু। ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে খ্রিস্টান পন্ডিতগণের মাঝে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে এবং অধিকাংশ খ্রিস্টানী এই মতবাদের মর্মার্থ বোঝে না অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এ ব্যাপারে সমস্ত বিভ্রান্তি নিরসন করে আল্লাহ বলেছেন

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ وَلَا تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَـقَّ‌ؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ‌ۚ اَلۡقٰٮهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ‌ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ‌ۚ وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ‌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّـكُمۡ‌ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ‌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ‌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ‌ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ۝

হে কিতাবীগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বল না। মারইয়াম-তনয় ‘ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহ্ র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আন আর বল না, ‘তিন!’ নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে-তিনি এটা হতে পবিত্র। আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্ র ই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

—আন নিসা - ১৭১

প্রচলিত খ্রিষ্টধর্ম

কথা ছিল খ্রিষ্টধর্ম কেবল বনি ইসরাইলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু 'যীশুর জীবদ্দশায় যীশুবিরোধী' একজন ইহুদি পন্ডিত,যিনি জীবনে কখনো যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি।যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের অনেক পরে তিনি হঠাৎ করে দাবি করেন যে যীশু তাকে শিষ্যত্ব প্রদান করেছেন বর্তমানে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টধর্ম এ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা। যার নাম ছিল Saul, সে নিজের রোমান নাম রাখল Paul. সে ছিল রোমান রাজদরবারে 'নাগরিক' (citizen) পদমর্যাদার, এইজন্য রোমান নাম। ঈসা-নবির শোকাচ্ছন্ন সঙ্গীসাথিদের কাছে সে হুট করে উদয় হয়ে জানাল, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের মরণোত্তর দেখা হয়েছে। ঈসা তাকে বলেছেন, অ-ইহুদিদের মাঝেও সত্যধর্মের দাওয়াহর কাজ করতে। অথচ ঈসা-নবি কিন্তু বারবার সতর্ক করে বলে গেছেন-

These twelve Jesus sent out with the following instructions: Do not go onto the road of the Gentiles or enter any town of the Samaritans, Go rather to the lost sheep of Israel. [Matthew 10:5-7]

এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন অ-ইহুদিদের (জেন্টাইল) রাস্তায় যেয়ো না কিংবা সামারিটান (ইহুদিদের এক গ্রুপ)-দের কোনো শহরে প্রবেশ কোরো না; বরং ইসরাইলের হারানো ভেড়াদের (নবি ইসহাকের পথভ্রষ্ট সন্তানদের) কাছে যাও। (মানে কেবল ইহুদি দাওয়াহ করতে বলেছেন) (১) ডায়াস্পোরাগুলোতে

Then Jesus said to the woman, "I was sent only to help God's lost sheep the people of Israel." [Matthew 15:24]

(এক অ-ইহুদি নারী এসেছিল সাহায্যের জন্য) তখন যীশু নারীটিকে বললেন: আমি কেবল ঈশ্বরের হারানো ভেড়াদের সাহায্য করার জন্য প্রেরিত হয়েছি ইসরাইলের বংশধরদের প্রতি (বনি ইসরাইল)।

সেসময় বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এজনাই ইসরাইলের (নবি ইয়াকুবের আরেক নাম) পরিবারের হারানো সন্তান বলে সম্বোধন করা হয়েছে বারবার। পারস্য সম্রাট নেবুচাদ-নেজার (বুখতনাসর) খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে জেরুসালেম লুট করে বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেয়, সকল তাওরাত পুড়িয়ে দেয়, ইহুদি গোত্রগুলোকে দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। পরে 'ইহুদিদের ঈশ্বরে' বিশ্বাসী পারস্যরাজ মহান সাইরাস (অনেক ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিকেই কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন মনে করেন) তাদেরকে মুক্তি দেন, বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। তবে ব্যাবিলন থেকে সব ইহুদি গোত্র ফিলিস্তিনে ফিরে আসেনি। অনেকে পারস্যেই থেকে যায়, কেউ এদিকপানে সরে এসে আফগান, এমনকি দক্ষিণ ভারতেও চলে আসে বলে জানা যায়। এ ছাড়া ইউরোপের বড় বড় শহরে ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ে (Jewish Diaspora)। মোদ্দাকথা, ঈসা আলাইহিস সালাম বিশ্বনবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের নবি। এজন্য হাওয়ারিগণকেও(ঈসা (আঃ) এর সহচর ও সঙ্গী)তাদের দাওয়াতি মিশন স্পষ্ট করে দিয়েছেন: শুধু ইহুদি বসতিগুলোয় যাবে তোমরা, অ-ইহুদিদের বসতি তো দূরে থাক, ওদের রাস্তায়ও যাবে না। যেহেতু আমার দাওয়াত অ-ইহুদিদের জন্য নয়।

তোমরা, অ-ইহুদিদের বসতি তো দূরে থাক, ওদের রাস্তায়ও যাবে না। যেহেতু আমার দাওয়াত অ-ইহুদিদের জন্য নয়।

কিন্তু এই স্বঘোষিত শিষ্য ও 'সাবেক শত্রু' পলা। ঈসা-নবির দাওয়াহর মধ্যে কিছু সংস্কার আনল, যার মধ্যে প্রধান হলো ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের নবি থেকে বিশ্বনবি ঘোষণা। পিটার(২) হলেন 'ইহুদির প্রতি প্রেরিত' (apostle to the jews) আর পল নিজেকে ঘোষণা করল 'অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত' (apostle to the gentiles), যেটা করার কথা ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, পল কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় শিষ্য ছিল না, তীব্র শত্রু ছিল; কিন্তু এখন তাকে সরাসরি শিষ্যদের সমান মনে করা হয়। অ-ইহুদিদের দাওয়াহ করার ক্ষেত্রে পল তাওরাতের আইনকে শিথিলভাবে উপস্থাপন করত, ক্ষেত্রবিশেষে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে। এই যেমন ধরেন-খতনা করার দরকার নেই, মদ্যপান চলবে, শনিবার পালনের দরকার নেই, শুকর খাওয়ার নিষেধ নেই ইত্যাদি।

বস্তুবাদী মূর্তিপূজক রোমানরা পলের খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন একটা প্রশ্ন ওঠে: অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টান হতে হলে আগে ইহুদি হতে হবে কি না, খৎনা, শনিবার পালন, খাবারে বাছবিচার এগুলো করতে হবে কি না। ৪৯ সালে জেরুসালেমে apostolic council-এ সিদ্ধান্ত হয়, মুশরিকরা ইহুদি না হয়েই খ্রিষ্টান হতে পারবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পিটার আর পলের মাঝে বিবাদও হয়, কারণ পিটার তাওরাতের শারিয়া মানা বাধ্যতামূলক মনে করতেন,

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা অনুযায়ী। শেষমেশ এভাবে সমাধা হয়, কেউ কারো কাজে নাক গলাবে না। এভাবে খ্রিষ্টানরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল-

> আলফা খ্রিষ্টান: 'ইহুদীয়-খ্রিষ্টান' [পিটারের অনুসারী অর্থাৎ ঈসা আ. এর আসল অনুসারী মুসলিম]

>> বিটা খ্রিষ্টান: 'অ-ইহুদি খ্রিষ্টান' [পলের অনুসারী বা বর্তমান খ্রিষ্টান]

বাইবেল বলা কিতাবুল মুকাদ্দাস এর পুস্তকগুলির নাম' ও সংখ্যা

খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে ভারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ) পূর্বে আগত নবীগণের মাধ্যমে সেগুলি তাদের নিকট পৌছেছে। দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থগুলির বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ.)-এর পরে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে সেগুলি লিখিত হয়েছে। প্রথমভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) এবং দ্বিতীয়ভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'নতুন নিয়ম' (New Testament) বলে অভিহিত করা হয়। উভয় নিয়মের সমষ্টিকে বলা হয় 'বাইবেল'। এটি একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ 'গ্রন্থ'। পুরাতন ও নতুন নিয়ম একত্রে ছাপানো বইটির উপরে লেখা হয়: 'পবিত্র বাইবেল'

পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলি

প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের নিকট স্বীকৃত 'প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল' বা কিং জেমস ভার্শন অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রথম অংশ বা পুরাতন নিয়মের মধ্যে বর্তমানে ৩৯ টি পুস্তক বিদ্যমান। তাওরাতের গ্রীক সংস্করণের মধ্যে উপর্যুক্ত ৩৯ টি পুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত সাতটি পুস্তক রয়েছে যেগুলোকে প্রটেস্ট্যান্টগণ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এভাবে গ্রীক তাওরাত (ক্যাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) এর পুস্তক সংখ্যা ৪৬ তবে খৃস্টানগণ বর্তমান সময়ে রূপকভাবে পুরাতন

নিয়মের সকল গ্রন্থের সমষ্টিকে তাওরাত বা তোরাহ নামে আখ্যায়িত করেন 'তাওরাহ' একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ 'শিক্ষা ও বিধিবিধান'।

নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলি

খৃস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের দ্বিতীয় অংশকে 'নতুন নিয়ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমানে এ অংশের মধ্যে ২৭টি পুস্তক বিদ্যমান:

১. মথিলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Matthew)

২. মার্কলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Mark)

৩. লুকলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Luke)

৪. যোহন লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. John)

এই চারটি গ্রন্থকে 'ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়' বলা হয়। 'ইঞ্জিল' শব্দটি শুধু এই চারটি গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য। তবে খ্রিস্টান গন বর্তমান সময়ে রূপক ভাবে নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থের সমষ্টিকে উপর্যুক্ত চারটি পুস্তক ও বাকি ২৩ টি পুস্তকের সমষ্টিকে ইঞ্জিল বলে আখ্যায়িত করেন।

তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল প্রসঙ্গ

বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি দাবি করেছেন যে অনুসারে তাওরাত,যাবূর ও ইঞ্জিল মান্য করা মুসলিমদের দায়িত্ব। প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিল যারা মানবে না তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। বিষয়টি খ্রিস্টান প্রচারকদের একটি ষড়যন্ত্রের অংশ। মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করতে বিগত কয়েক যুগ যাবৎ তারা নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান না বলে প্রতারণামূলকভাবে “ঈসায়ী মুসলমান “বলেন যদিও ইংরেজিতেও কখনোই তারা নিজেদেরকে Christian Muslim বলেন না বরং Christian বলেন। Christian Muslim কথাটিকে যে কোন খ্রিস্টান পাগলের প্রলাপ বলে গণ্য করবেন

মুসলিমদের রয়েছে। আর তা জানার জন্যই এ আলোচনা।

প্রচলিত এ গ্রন্থগুলি কখনোই মূল তাওরাত, যাবুর বা ইঞ্জিল নয়। এগুলি মূল গ্রন্থের সাথে অগণিত মিথ্যা মিশ্রিত কয়েকটি জাল গ্রন্থ ছাড়া কিছুই নয়। সকল ইহুদী-খৃস্টান গবেষক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত তাওরাত, যাবুর, ইনজীল বা বাইবেলের

পুস্তকগুলি সবই মানবরচিত এবং অগণিত বিকৃতি ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। তবে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, বাইবেলে কোনো ভুল নেই, তার প্রমাণ কুরআনে এগুলির প্রশংসা করা হয়েছে এবং এগুলিতে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। তারা বলেন, কুরআন প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (স) এর যুগে প্রচলিত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ছিল। আর সে যুগে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল ছিল বর্তমান যুগে সেগুলিই প্রচলিত। তাদের এ দুটি দাবিই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন অবতরণের পরেও তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলে অনেক বিকৃতি সাধন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত। তবে আমরা এখানে কুরআন নাযিলের সময়ে এ সকল গ্রন্থের অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

কুরআনের আলোকে তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল

কুরআন মাজীদ বারংবার উল্লেখ করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মূসা (আ) কে "তাওরাত" নামক গ্রন্থ, দায়ূদ (আ) কে "যাবুর" নামক গ্রন্থ এবং ঈসা (আ) কে "ইঞ্জিল" নামক গ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেন। এ গ্রন্থগুলির মধ্যে ছিল আল্লাহর হেদায়াতের নূর ও বরকতময় বিধিবিধান। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের অনুসারীরা এগুলি বিকৃতি করে। কুরআন তিন প্রকারের বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছে: (১) ভুলে যাওয়া, (২) বিকৃত করা ও (৩) জাল কথা সংযোজন করা এরূপ বিকৃতিসহ "তাওরাত", "যাবুর" ও "ইঞ্জিল" নামে গ্রন্থগুলি সে যুগে বিদ্যমান ছিল,যেগুলোর মধ্যে তিন প্রকার বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি মূল ওহীর অনেক কিছু বিদ্যমান ছিল।

আল-কুরআনকে বিচারক ও সংরক্ষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরআন বাইবেলের তিন প্রকার বিকৃতির কথা ঘোষণা করেছে। বিগত প্রায় ১২/১৩ শত বৎসর যাবৎ ইহুদী- খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করে এসেছেন যে, তাদের হাতে বিদ্যমান তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ আক্ষরিকভাবে আল্লাহর ওহী ও বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান। কিন্তু বিগত প্রায় ২০০ বৎসরে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃস্টান গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনের ঘোষণা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আসুন আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করি।

তারা তাদের গ্রন্থের একাংশ ভুলে গিয়েছে

ইহুদী-খৃস্টানদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

“ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে আমি তাদেরকে লা‘নত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি ; তারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল এর এক অংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা এদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে, সুতরাং এদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

—আল মায়িদাহ - **১৩**

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান’, তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি ; তারা যা করত আল্লাহ্ তাদেরকে অচিরেই তা জানিয়ে দিবেন।

—আল মায়িদাহ - **১৪**

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যারা মুখে বলে, ‘ঈমান এনেছি’, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না এবং ইয়াহ,দীদের মধ্যে যারা অসত্য শুনতে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে। শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, ‘এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ কর এবং তা না দিলে বর্জন কর।’ এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্যে আল্লাহ্ র নিকট তোমার কিছু করার

নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্যে আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে আছে তাদের জন্যে মহাশাস্তি।—আল মায়িদাহ - ৪১

'ভুলে যাওয়ার' বিষয়ে খৃস্টান গবেষকগণের গবেষণা কুরআনের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। ইহুদী ও খৃস্টানগণ বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের অনেক শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। নিম্নের বিষয় দুটি তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে: (১) মূল ভাষার কোনো পাণ্ডুলিপি না থাকা বস্তুত খ্রিস্টানদের অবহেলায় মূল ইঞ্জিলটি হারিয়ে গিয়েছে এবং (২) অনেক গ্রন্থের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হওয়া।

জাল কথা সংযোজন করা

ইহুদি খ্রিষ্টানগণ পুস্তক রচনা করে তা আল্লাহর কিতাব নামে চালাত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ * ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ ۝

সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্যে বলে, ‘এটা আল্লাহ্ র নিকট হতে।’ তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্যে শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যে শাস্তি তাদের।

শানে নুজুলঃ

হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত, তওরাত কিতাবে হুজুরে পাক ﷺ-এর এরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর নয়ন যুগল হবে ডাগর, যেন সুরমা লাগানো রয়েছে, আর তাঁর উচ্চতা হবে মাঝারি। কেশরাশি হবে হালকা কোঁকড়ানো আর চেহারা মোবারক হবে সুন্দর। অথচ ইহুদী সম্প্রদায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর অত্র গুন সমূহ বিকৃত করে প্রচার করতে লাগলে যে, আমাদের কিতাবে বলা হয়েছে, তিনি লম্বা ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট আর তাঁর চুল হবে সোজা। তাদের এহেন অসৌজন্য মূলক আচরন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত অবতীর্ন করেন।- বায়ানুল কুরআন

—আল বাকারা - ৭৯

وَاِنَّ مِنۡہُمۡ لَفَرِیۡقًا یَّلۡوٗنَ اَلۡسِنَتَہُمۡ بِالۡکِتٰبِ لِتَحۡسَبُوۡہُ مِنَ الۡکِتٰبِ وَمَا ہُوَ مِنَ الۡکِتٰبِ ۚ وَیَقُوۡلُوۡنَ ہُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ وَمَا ہُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ ۚ وَیَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ وَہُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۸﴾

আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দিয়ে বিকৃত করে যাতে তোমরা একে আল্লাহ্ র কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু ওটা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহ্ র পক্ষ হতে', কিন্তু তা আল্লাহ্ র পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

—আলে ইমরান - ৭৮

এভাবে আমরা দেখেছি যে তাওরাত ও ইঞ্জিল নামে বা কিতাবুল মুকাদ্দাস নামে প্রচলিত গ্রন্থ গুলোর মধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টানদের স্বীকৃতি অনুসারেই অনেক জাল বা সন্দেহজনক প্রস্তুত বিদ্যমান।

ইসকনের কারনামা

হিন্দুবেশধারী ইহুদীদের একটি সংগঠন। আবু রুশদের লেখা---"বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা- বাংলাদেশে 'র' বইয়ে লেখা আছে- “'ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দফতর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলতঃ এটা ইহুদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।". (বই- বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা- বাংলাদেশে 'র' পৃষ্ঠা:১৭১)

আপনাদের জেনে রাখা দরকার, ইসকনের সৃষ্টি কিন্তু ভারতে নয় আমেরিকার নিউইয়র্কে। মাত্র ৫০ বছর আগে, ১৯৬৬ সালে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতার নাম 'অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ'। অবাক হওয়ার মত বিষয়, এ ব্যক্তি ভারতে কোন হিন্দু শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করেনি, লেখাপড়া করেছে খ্রিস্টানদের চার্চে। পেশায় সে ছিলো ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসায়ী, কিন্তু হঠাৎ করেই তার মাথায় কেন হিন্দু ধর্মের নতুন সংস্করণের ভুত চাপলো, কিংবা কোন শিক্ষাবলে চাপলো তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। স্বামী প্রভুপাদ নতুন ধরনের হিন্দু সংগঠন চালু করতেই প্রথমেই তাতে বাধা

দিয়েছিলো মূল ধারার সনাতন হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দুই তার বিরুদ্ধচারণ শুরু করে। কিন্তু সেই সময় স্বামী প্রভুপাদের পাশে এসে দাড়ায় জে. স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মত চিহ্নিত ইহুদী-খ্রিস্টান এজেন্টরা।

ইসকন একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন। এ সংগঠনটির বেসিক কনসেপ্ট মধ্যযুগের চৈতন্য'র থেকে আগত। চৈতন্য'র অনতম থিউরী হচ্ছে- "নির্যবন করো আজি সকল ভুবন"। যার অর্থ- সারা পৃথিবীকে যবন মানে মুসলমান মুক্ত করো।

উল্লেখ্য- এ সংগঠনটি হিন্দুদের অধিকাংশ বেসিক কনসেপ্ট স্বীকার করে না। তারা হিন্দুদের উপর সম্পূর্ণ নিজস্ব কনসেপ্ট চাপিয়ে দেয়। এদের চেনার সহজ উপায়- এরা সব সময় ইউরোপীয় সাদা চামড়াদের সামনে নিয়ে আসে। সংগঠনটি মুলত এনজিও টাইপ। এরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে ভিড়িয়ে দল ভারি করে। এ কারণে তাদের আস্তানাগুলো হয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আস্তানার পাশে। যেমন ঢাকা শহরে স্বামীবাগ মন্দিরের পাশে ইসকন মন্দির হওয়ার কারণ, স্বামীবাগে রয়েছে বিশাল মেথর পট্টি। এই মেথর পট্টির নিচুবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে তারা দল ভারি করে। সিলেটেও ইসকনদের প্রভাব বেশি। কারণ চা শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ নিচু বর্ণের হিন্দু। এদেরকে দলে নিয়ে সহজে কাজ করে তারা।

বর্তমানে ইসকন চালায় ডাইরেক্ট ইহুদীরা। ইসকনের মূল নীতিনির্ধারকদের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে ইহুদী। এটি আমার কোন দাবি নয়, এক ইসকন নেতারই দাবি।

বাংলাদেশে ইসকন কি চায় ও কি করে ??
স্বাভাবিকভাবে ইসকনের কর্মকাণ্ড শুধু নাচ মনে হলেও আদৌ তা নয়। ইসকনের কয়েকটি কাজ নিম্নরূপ-

১) বাংলাদেশে সনাতন মন্দিরগুলো দখল করা এবং সনাতনদের মেরে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। যেমন স্বামীবাগের মন্দিরটি আগে সনাতনদের ছিলো, পরে ইসকনরা কেড়ে আগেরদের ভাগিয়ে দেয়। এছাড়া পঞ্চগড়েও সনাতনদের পিটিয়ে এলাকাছাড়া করে ইসকনরা। ঠাকুরগাও-এ সনাতন হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। এছাড়া

অতিসম্প্রতি সিলেটের জগন্নাথপুরে সনাতনদের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন নেতা মিণ্টু ধর।

২) বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে সাম্প্রদায়িক হামলা করা। কিছুদিন আগে ঢাকাস্থ স্বামীবাগে মসজিদের তারাবীর নামাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো ইসকন। নামজের সময় ইসকনের গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে এনে তারাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এবার হলো সিলেটে।

৩) বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরী করে, উগ্রহিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু, বেদান্ত, ইত্যাদি। বর্তমান অনলাইন জগতে যে ধর্ম অবমাননা তার ৯০% করে ইসকন সদস্যরা।

৪) বাংলাদেশে সম্প্রতিক সময়ে চাকুরীতে প্রচুর হিন্দু প্রবেশের অন্যতম কারণ-ইসকন হিন্দুদের প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

৫) সিলেটে রাগীব রাবেয়া মেডিকলে কলেজের ইস্যুর পেছনে রয়েছে ইসকন। ইসকন আড়াল থেকে পুরোঘটনাপরিচালনা করে এবং পঙ্কজগুপ্তকে ফের লেলিয়ে দেয়। এখন পঙ্কজগুপ্ত জমি পাওয়ার পর সেই জমি নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিচারবিভাগে ইসকনের প্রভাব মারাত্মক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ খোদ প্রধানবিচারপতিও একজন ইসকন সদস্।

২০১৯ সালে "আমাদের সময়'' পত্রিকায় ইসকনের সমালোচনা মানে সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধিতা নয়" এই শিরোনামে ফরহাদ মজহারেরলেখা এক কলামে ইসকন সম্পর্কে বিস্ফোরক কিছু তথ্য উল্লেখ করেছিল ফরহাদ মজহার।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭৭ সালে মারা গেছেন। এরপরে ইসকন যে রূপে বিবর্তিত হয়েছে, এর সাথে তার আদি কল্পের মিল আছে কি না, তা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বিশেষত দুটো বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ। একটি অভিযোগ, সংগঠনটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের চেয়েও বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা তৎপরতা এবং সাম্প্রতিককালে ইসরায়েল ও ভারতীয় গোয়েন্দা তৎপরতার আদর্শ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং ভারত ও ইসরায়েলের গভীর সামরিক, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধ ও

সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইসকন বাংলাদেশে তাদের এহেন তৎপরতার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম কি না, সেই তর্ক উঠেছে।

ইসকন-এ 'প্রভু'দের নাম পরিবর্তন করবার রীতির ফলে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বা আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখা সহজযেমন,ইসকনের প্রভাবশালী নেতা জয়াদ্বৈত স্বামীর আসল নাম 'জে ইসরায়েল' (Jay Israel), তার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যে একটি ইহুদি পরিবারে। ইসকনের নীতিনির্ধারণে ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকজন অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হচ্ছেন রাধানাথ স্বামী। তার আসল নাম রিচার্ড স্লাভিন (Richard Slavin)। তিনিও পারিবারিক সূত্রে ইহুদি। তার মা ইডেল ও জেরাল্ড স্লাভিন। তারা রাশিয়া, রুমানিয়া, পোলান্ড ও লিথুয়ানিয়া থেকে যেসব ইহুদি পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে রিফিউজি হিসেবে এসেছেন, তাদেরই সন্তান। ভারতে ও বাংলাদেশে স্কুলের বাচ্চাদের দুপুরের খাবার পরিবেশনার কর্মসূচি রিচার্ড স্লাভিনের পরিকল্পনা। স্লাভিন ইসকনের কার্যকলাপ বোম্বাইয়ে বসে পরিচালনা করেন। চট্টগ্রামে স্কুলের বাচ্চাদের 'প্রসাদ' খাইয়ে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়ে নেয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ফলে ইসকন বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।

জে ইসরায়েল ও রিচার্ড স্লাভিন দুইজনই ৪০ থেকে ৫০ বছর ধরে ইসকনের নীতিনির্ধারণী কাজে জড়িত। স্লাভিন ইসকনের গভর্নিং বডি সদস্য এবং একজন দীক্ষাগুরু। অন্যদের আসল পরিচয় জানলে ইসকনের পরিচালনা কমিশন আসলে কারা চালায়, তা বোঝা যাবে। এই তথ্য জোগাড় করা সরকারেরই দায়িত্ব।

সংগঠন হিসেবে ইসকনের বিবর্তনটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর দ্রুত ঘটেছে। ভক্তদের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তর্কের বিষয় হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে সংগঠনটিতে 'ইথনিক', বিশেষভাবে ইহুদি প্রভাব বেড়েছে কি বাড়েনি- সে প্রসঙ্গ। এ অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদের ধর্মচিন্তার ধারণা থেকে ইসকন 'বিচ্যুত' হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভক্তদের মধ্যে ইহুদি প্রভাবের একটা নামও আছে : 'জেবিডি' (Jewish Background Devotee)। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা যখন ইসকনকে একটি 'ইহুদি' সংগঠন বলে দাবি করেন ও জায়নিস্ট তৎপরতা প্রতিরোধের কথা বলেন, তখন তারা আসলে ইসকনের বিপুলসংখ্যক কৃষ্ণভক্তের অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি করেন। একে নিছক ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে গণ্য করার কারণ নেই।

বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন আইনজীবী আল মামুন রাসেল। সেই নোটিশে উল্লেখ করা

হয়েছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, ইরান, আফগানিস্তান ও রাশিয়াতে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে **১৯৭০** ও **১৯৮০'র** দশকে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে **১৯৯১** সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ইসকন রাশিয়া ও অন্যান্য সাবেক সোভিয়েত দেশে কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি পায়।

এছাড়া ইসকনের কর্মকাণ্ড তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও তুর্কেমেনিস্তানে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয় বলেও আইনি নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সবার শেষ কথা হচ্ছে- বাংলাদেশে যদি এখনই ইসকনকে নিষিদ্ধ না করা হয়, তবে বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে, যেই বিপদে বাংলাদেশে স্বাধীনতা হারালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অমুসলিমদের

অপতৎপরতার সংজ্ঞা ও ধরন

অপতৎপরতার ধারনা

অপতৎপরতা শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় এমন কার্যক্রম বা কার্যকলাপ, যা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং যা ক্ষতিকারক, বিভ্রান্তিকর বা ধ্বংসাত্মক হতে পারে। এটি সাধারণত পরিকল্পিতভাবে চালানো হয় এবং এর লক্ষ্য হয় কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, ঐক্য, সংস্কৃতি, বা ক্ষমতা দুর্বল কর

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও ইসলাম সম্পর্কে প্রচারিত ভুল তথ্য অনেক সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, অজ্ঞতা বা বিরোধিতা থেকে ঘটে থাকে। এসব অপপ্রচার প্রায়ই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। এখানে কিছু সাধারণ ভুল তথ্য তুলে ধরা হলো, যা অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে প্রচার করতে পারে।

ধর্মীয় অপতৎপরতা

ধর্মীয় অপতৎপরতা বলতে বোঝায় এমন
কার্যকলাপ যা ধর্মীয় ভিত্তিতে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, বিশৃঙ্খলা তৈরি করে বা অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ছড়ায়। এটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।
নিচে কিছু ধর্মীয় অপতৎপরতার ধরন ও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো:

➡ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম

একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো যে ইসলাম সহিংস ধর্ম, কারণ কিছু ইসলামিক গোষ্ঠী যেমন তালেবান, আল-কায়েদা, বা আইএস তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সহিংস কার্যক্রম চালায়। তবে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে শান্তি, সহনশীলতা, এবং ন্যায়বিচারের ধর্ম। কুরআন ও হাদিসে সহিংসতা শুধুমাত্র আত্মরক্ষা বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদিত। ইসলামের মূল বাণী হল শান্তি। কুরআনে বলা হয়েছে,

اُدۡعُوۡا رَبَّکُمۡ تَضَرُّعًا وَّ خُفۡیَۃً ؕ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الۡمُعۡتَدِیۡنَ ۚ

তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি সীমালংঘন-কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

—আল আ'রাফ - ৫৫

➡ইসলাম নারীদের অধিকারকে দমিয়ে রাখে:

অনেকে দাবি করেন যে ইসলাম নারীদের অধিকার হরণ করে, তাদের পর্দা বা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে তাদের ভূমিকা সীমিত করে দেয়। তবে, এটি ভুল। ইসলাম নারীদের জন্য অনেক অধিকারের ব্যবস্থা করেছে, যেমন পিতার পর মেয়েকে সন্তানের অধিকার, মৌলিক শিক্ষা, সম্পত্তিতে অংশীদারি, এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।
ইসলাম নারীদের সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,
"তোমাদের মধ্যে যে কেউ ভালো কাজ করবে, তাকে পুরুষ বা নারী হিসেবে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আল-আহজাব: ৩৫)

➡জিহাদ মানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

"জিহাদ" শব্দটি সাধারণত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা যুদ্ধের সাথে যুক্ত করা হয়, তবে ইসলামের মধ্যে "জিহাদ" মূলত নিজেকে সংশোধন, ধর্মীয় দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহর

পথে সংগ্রাম করতে বোঝানো হয়। যুদ্ধে গেলে, এটি আত্মরক্ষার জন্য এবং মুসলিম জাতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়।

কুরআনে উল্লেখিত জিহাদ মূলত আত্মসংযম, নৈতিকতা, এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখার সংগ্রামকে বোঝায়।

"এটি আল্লাহর পথে সংগ্রাম, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের প্রতিরোধ করো।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

➡ মুসলমানরা সব সময় অগোছালো এবং পিছিয়ে থাকে

মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল, তবে ইসলামের মধ্যে কোনো কিছুই পিছিয়ে থাকা বা অগোছালো হওয়ার নয়। ইসলামের শিক্ষা মানুষের মর্যাদা, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেয়।

ইসলাম মানুষের উন্নতির জন্য, শিক্ষা অর্জন এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ তার জন্য পথপ্রদর্শন করেন যারা সত্য অনুসন্ধান করে।" (সূরা আল-ইসলা: ৮)

➡ ইসলাম ধর্ম মানুষকে অন্য ধর্মগ্রহণ থেকে বিরত রাখে বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করে

অনেকে ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে ইসলাম ধর্ম মানুষকে অন্য ধর্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে বাধ্য করে বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে বলে। তবে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বা ধর্ম পরিবর্তনের অধিকার সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব

কুরআনে বলা হয়েছে,

"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই, সত্য ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

➡ ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে মানা

অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে যে, মুসলিমরা মনে করেন শুধু ইসলামই সত্য ধর্ম। যদিও ইসলাম বিশ্বাস করে যে কেবল ইসলামই আল্লাহর শেষ ও সঠিক ধর্ম, ইসলাম সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতার আহ্বান জানায়।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

"আমরা তোমাদের মধ্যে আলাদা জাতি সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

➡ মুসলিমরা সকলেই এক মতাদর্শের অনুসারী

অনেকে মনে করেন যে মুসলিমরা সকলেই এক ধরনের মতাদর্শ বা এক ধরনের বিশ্বাসের অনুসারী। তবে বাস্তবে, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শ (যেমন সুন্নি, শিয়া) রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা থাকতে পারে।

ইসলামে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ইসলামের মূল বিষয়গুলি সকল মুসলিমের জন্য একই।ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা এবং ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা দুটি সমাজে সাঙ্কেতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে প্রতিটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হলো:

➡ ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা:

ধর্মান্তর, বা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে রূপান্তর হওয়া, বহু দেশ ও সমাজে একটি সংবেদনশীল বিষয়। ইসলাম ধর্মের জন্য, যারা অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তারা সাধারণত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ইসলামিক জীবনধারা অনুসরণ করতে শুরু করেন। তবে, কিছু ক্ষেত্রে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া বা ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখানোর কারণে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে পারেন। কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা বা ইসলামের প্রতি আগ্রহকে বিপদ হিসেবে দেখেন এবং তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কারণ তাদের মতে এটি সামাজিক বা ধর্মীয় অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

➡ ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা:

ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা বা ইসলামবিদ্বেষ (Islamophobia) বেশ পুরনো একটি প্রবণতা। এটি সমাজে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ বা ইসলাম ধর্মের প্রতি ভুল বা নেতিবাচক ধারণা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্রচারণা চালানো হয়। মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব, যেমন ঈদ, রমজান বা কুরবানি, এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। কিছু ক্ষেত্রে, অমুসলিমরা এই ধর্মীয় উৎসবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বা তাদেরকে অপমানিত করার জন্য কটাক্ষমূলক আচরণ বা ভাষা ব্যবহার করে। এছাড়া ইসলামী স্থাপত্য বা শিল্পকলা সম্পর্কেও নেতিবাচক মন্তব্য করা হতে পারে।

সাংস্কৃতিক অপতৎপরতা

মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিচিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিছু গোষ্ঠী বিশেষ ভাবে সংস্কৃতিগত বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। এটি হতে পারে কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে মুসলিমদের সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্য বা পোশাকের প্রতি বিদ্বেষ দেখানো হয়।

➡ পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আধিপত্য ইসলামী মূল্যবোধের সংঘর্ষ

ভোগবাদ বনাম আত্মসংযম: পশ্চিমা সমাজের ভোগবাদী জীবনধারা ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষে থাকে, কারণ ইসলাম শরীরের সঙ্গতিপূর্ণ এবং পরিমিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। পশ্চিমা বিজ্ঞাপন, মিডিয়া এবং খাদক সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে কখনও কখনও বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

পূর্ব-পশ্চিম সাংস্কৃতিক পার্থক্য: পশ্চিমা সভ্যতা সাধারণত একক পরিবার বা "বিনোদনপ্রিয়" সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছে, যেখানে একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশ গুরুত্ব পায়। ইসলাম পরিবারকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় আনে এবং সমাজের জন্য ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালনকেই প্রাধান্য দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় শাসন: পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে রাষ্ট্র এবং ধর্ম আলাদা থাকে। তবে ইসলামি সমাজে ধর্মীয় আইন (শরিয়া) সমাজের আইনি কাঠামোর অঙ্গ, যা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

➡ ইসলামী পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারণা:

ইসলামী পোশাক বিশেষত নারীদের হিজাব বা পর্দা প্রথা, পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কিছু সমাজে বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকে। হিজাব পরা মুসলিম নারীদের প্রতি একধরনের অগ্রহণযোগ্যতা বা বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, কারণ পশ্চিমা সমাজে নারীদের পোশাকের স্বাধীনতা এবং খোলামেলা জীবনধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইসলামী পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারিত কিছু নেতিবাচক ধারণা হলো:

সহিংসতা বা পুরুষতান্ত্রিকতা: হিজাব বা ইসলামী পোশাককে অনেক সময় পুরুষদের কর্তৃত্বের লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা নারীর স্বাধীনতা এবং সমতার বিরুদ্ধে হিসেবে দেখা হয়।

প্রতিরোধ বা সংকীর্ণতা: ইসলামী পোশাককে পশ্চিমা মানদণ্ডে "সংকীর্ণ" বা "পুরোনো" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা আধুনিকতার সাথে খাপ খায় না বলে প্রচারিত হয়।

স্বাধীনতার বিরোধিতা: কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী পোশাক পরিধানকে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা আধুনিক সমাজে নারীর স্বাধীনভাবে চলার উপায় হিসেবে দেখা হয়।

➡ ইসলামী খাদ্যাভাসের বিরুদ্ধে প্রচারণা:

ইসলামী খাদ্যাভাস যেমন হালাল খাদ্য, নাপাক বা হারাম খাবার থেকে বিরত থাকা, পশ্চিমা সমাজে কখনো কখনো হাস্যরসের বা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। ইসলামি খাদ্যসংস্কৃতি যা শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তা বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করা হতে পারে। কিছু প্রচারণা:

হারাম খাদ্য নিষিদ্ধকরণ: ইসলামী খাদ্যাভাসে মদ, শুয়োরের মাংস এবং কিছু অন্যান্য খাবারের নিষিদ্ধকরণের কারণে, পশ্চিমা সমাজে একে কঠোরতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিছু সময়ে এগুলোর মধ্যে "অযৌক্তিক" বা "অগ্রগামীতা" হিসেবে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়।

সামাজিক চাপ: হালাল খাদ্যের প্রতি মুসলিমদের অঙ্গীকার পশ্চিমা খাদ্যাভাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে একে পিছিয়ে পড়া বা আধুনিক সমাজের সাথে অমিল হিসেবে দেখানো হয়।

রাজনৈতিক অপতৎপরতা

অমুসলিমদের রাজনৈতিক অপতৎপরতা বলতে বোঝানো হয় এমন কার্যকলাপ যা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মুসলিম সমাজ, দেশ বা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ঐক্য বা উন্নয়নে বাধা দেয়। এই অপতৎপরতা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে সীমাবদ্ধ নয় এবং তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হতে পারে, যেমন ষড়যন্ত্র, বিভেদ সৃষ্টি, বা অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার।

অমুসলিমদের রাজনৈতিক অপতৎপরতার ধরন:

১. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি:

. আঞ্চলিক বিভাজন ও বিদেশি হস্তক্ষেপ:

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টার অন্যতম একটি কারণ হলো ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। কিছু বিদেশি শক্তি বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চায় যাতে তারা নিজেদের কৌশলগত স্বার্থ অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

শিয়া-সুন্নি বিভাজন: শিয়া ও সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের বিভাজনকে বিদেশি শক্তি যেমন ইরান এবং সৌদি আরব ব্যবহার করেছে। এই দুই দেশের মধ্যে

বিরোধ মূলত রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক আধিপত্যের কারণে, কিন্তু বাইরের শক্তি তাদের নিজস্ব স্বার্থে এই বিভাজনগুলোকে তীব্র করেছে।

ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের যুদ্ধ: এসব দেশে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষকে বিদেশি শক্তি ব্যবহার করে, যেমন ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যকার হস্তক্ষেপ এবং তাদের সম্পর্কিত শিয়া ও সুন্নি গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন।

তুরস্ক এবং কুর্দি সমস্যা: তুরস্কের বিরুদ্ধে কুর্দি আন্দোলন এবং কুর্দি অঞ্চলে কুর্দিদের স্বাধীনতা বা অধিকারের প্রশ্নও বিদেশি শক্তি দ্বারা উস্কে দেওয়া হতে পারে, যার ফলে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

২. সামরিক হস্তক্ষেপ:

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরির ক্ষেত্রে সামরিক হস্তক্ষেপও একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে:

ইউনাইটেড স্টেটস এবং পশ্চিমা শক্তির হস্তক্ষেপ: পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, লিবিয়া ও সিরিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ, এবং আফগানিস্তানে সামরিক উপস্থিতি এসব দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও সংঘর্ষকে আরো জটিল করে তুলেছে।

ভাষাগত এবং জাতিগত বিভাজন: অনেক মুসলিম দেশে জাতিগত বা ভাষাগত বিভাজন ব্যবহার করে বিদেশি শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, তুরস্ক এবং সিরিয়ার মধ্যে কুর্দিদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদেশি শক্তির সহায়তায় তীব্র করা হয়েছে, যা তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভাবিত করেছে।

৩. ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরির কৌশল:

বিদেশি শক্তি ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে, যার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কৌশল হলো:

ধর্মীয় গোষ্ঠী বা আন্দোলনের সহায়তা: কিছু বিদেশি শক্তি ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন বা গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেয়, যা স্থানীয় সরকারের প্রতি বিরোধিতা তৈরি করতে পারে। যেমন, মুসলিম ব্রাদারহুড বা অন্যান্য ইসলামি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়।

জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক কৌশল: বিদেশি শক্তি কখনো কখনো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বিভাজন তৈরি করতে তাদের নিরাপত্তা বা কৌশলগত

স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেয়, যা এক দেশ থেকে আরেক দেশে হস্তক্ষেপ এবং সহিংসতার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

৪. বিভাজন সৃষ্টি করার পরিণতি:

ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা মুসলিম বিশ্বে কিছু গুরুতর পরিণতি সৃষ্টি করেছে:

রাজনৈতিক অস্থিরতা: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন এবং সংঘর্ষ রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। এটি সরকার পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ: শিয়া-সুন্নি, আরব-অনারব বা অন্যান্য জাতিগত বিভাজন সমাজে গভীর[illegible] সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সমাজে একতার অভাব এবং সহিংসতা বেড়েছে।

আর্থিক এবং মানবিক ক্ষতি: দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ ও বিভাজনের কারণে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ শরণার্থী হয়ে পড়েছে।

মুসলিম নেতৃত্বকে দুর্বল করা:মুসলিম দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

উদাহরণ: রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন বা অভ্যুত্থান ঘটানো।

বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম দেশগুলোর প্রভাব হ্রাস:মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হ্রাস করার জন্য রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ।উদাহরণ: নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বাণিজ্য বাধা তৈরি, বা কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা।

সন্ত্রাসবাদ ও অস্থিতিশীলতার মদদ:মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার জন্য কিছু গোষ্ঠীকে সহায়তা করা।উদাহরণ: বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা চরমপন্থী দলকে অর্থায়ন ও অস্ত্র সরবরাহ।

ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা:মুসলিম রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বকে বিশ্ববাসীর কাছে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা।

উদাহরণ: সংবাদমাধ্যম বা আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকার দমন:অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার খর্ব করা।উদাহরণ: মুসলিমদের ভোটাধিকার সীমিত

করা, রাজনৈতিক প্রার্থী হতে বাধা দেওয়া, বা তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন।

অর্থনৈতিক অপতৎপরতা

অমুসলিমদের অর্থনৈতিক অপতৎপরতা বলতে বোঝানো হয় এমন কার্যক্রম যা মুসলিম দেশগুলো বা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তাদের সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রম বিভিন্ন উপায়ে পরিচালিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ শোষণ:

অমুসলিমরা অনেক সময় মুসলিম দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজ) এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে শোষণ করার চেষ্টা করে।

সামরিক আগ্রাসন বা রাজনৈতিক চাপ:

মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ দখলের জন্য সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চালানো।উদাহরণ: ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে সামরিক আগ্রাসন।

বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে শোষণ:

অসম বাণিজ্য চুক্তি বা শর্ত আরোপ করে সম্পদের একতরফা ব্যবহার।উদাহরণ: তেলের দামে বিশ্ববাজারে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ।

আধিপত্যবাদী প্রতিষ্ঠান:

বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ঋণের ফাঁদ তৈরি করে দেশগুলোর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ।

২. ইসলামিক ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার:

ইসলামিক অর্থনীতি সুদমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে। এটি প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক পদ্ধতির বিকল্প হওয়ায় কিছু অমুসলিম গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়।ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস্য বলা:

ইসলামিক অর্থনীতিকে অব্যবহারযোগ্য বা ব্যর্থ পদ্ধতি হিসেবে চিত্রিত করা।উদাহরণ: ইসলামিক ফাইন্যান্সিংকে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের সাথে মেলানো।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন:

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতিকে সুদ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করার জন্য চাপ সৃষ্টি।উদাহরণ: সুদের ওপর নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি।

অপপ্রচার ছড়ানো:

প্রচার করা যে ইসলামিক অর্থনীতি আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণে অক্ষম।

৩. মুসলিমদের বাণিজ্যিক উৎপাদন খাত সংকুচিত করার প্রচেষ্টা:

মুসলিম দেশগুলোর শিল্প ও উৎপাদন খাতকে দুর্বল করে তাদেরকে আমদানি নির্ভরশীল করার প্রচেষ্টা অনেক অমুসলিম গোষ্ঠীর কৌশল।

প্রযুক্তিগত বাধা:

উন্নত প্রযুক্তি বা দক্ষতা হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা তৈরি।উদাহরণ: মুসলিম দেশগুলোতে উচ্চমানের মেশিন বা কাঁচামালের সরবরাহে বাধা।

সস্তা পণ্যের আমদানি:

মুসলিম দেশগুলোর বাজারে সস্তা পণ্য আমদানি করে তাদের স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করা।উদাহরণ: চীনের সস্তা পণ্য আমদানির কারণে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষতি।

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা:

মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদের বাণিজ্য ও রপ্তানি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।উদাহরণ: ইরান বা সিরিয়ার মতো দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ:

মুসলিম দেশগুলোর দক্ষ শ্রমশক্তিকে সস্তা মজুরিতে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে দমিয়ে রাখা।

সামরিক চাপ:

মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক চাপ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গেছে, বিশেষ করে ২০শ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই সামরিক চাপ কখনো সরাসরি আক্রমণ বা যুদ্ধের মাধ্যমে, কখনো বা আঞ্চলিক সংঘর্ষে বিদেশি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিছু উদাহরণ হলো:

ইরাক যুদ্ধ (২০০৩): যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ইরাকের সাদ্দাম হুসেইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস এবং সাদ্দামের শাসন শেষ করা। যদিও এই যুদ্ধের ফলে ইরাকের রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমা শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপ মুসলিম বিশ্বের মধ্যে গভীর বিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

আফগান যুদ্ধ (২০০১-২০২১): তালেবান সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলার পর আফগানিস্তান আজও যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে রয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধ (২০১১-বর্তমান): সিরিয়ায় অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে পশ্চিমা দেশগুলো ও আরব দেশগুলোর সমর্থন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব এবং তুরস্কসহ অন্যান্য শক্তি সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

আর্থিক চাপ:

মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে আর্থিক চাপ একটি বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক অবরোধ, এবং অন্যান্য আর্থিক বাধার মাধ্যমে দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। কিছু উদাহরণ:

ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা: ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের ফলে ২০১০ সাল থেকে ইরানের উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞাগুলো ইরানের অর্থনীতি, বিশেষ করে তেল শিল্পকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইরানের উপর আর্থিক চাপের লক্ষ্য ছিল তাদের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করা।

সৌদি আরব ও কাতারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (২০১৭-২০২১): সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং মিশর, কাতারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তাদের অভিযোগ ছিল, কাতার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন দেয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিষয়ে সৌদি আরবের নীতির বিপরীতে অবস্থান নেয়।

আরব বসন্তের পর অর্থনৈতিক অস্থিরতা: ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর, মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘর্ষের ফলে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগে বিরতি এসেছে, যা দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি করেছে।

৩. কূটনৈতিক চাপ:

কূটনৈতিক চাপ মুসলিম দেশগুলোর বৈদেশিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। পশ্চিমা শক্তি মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক ইস্যুগুলিতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে।

ফিলিস্তিন ইস্যু: প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েল ইস্যুতে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে ইসরায়েলের সমর্থন এবং মুসলিম

দেশগুলোর ঐক্যহীনতার কারণে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সমর্থন করতে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক চাপ বাড়ানো হয়।

শরিয়া আইন এবং মানবাধিকার: কিছু পশ্চিমা দেশ মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার এবং শরিয়া আইন ইস্যুতে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছে। যেমন, আফগানিস্তানে তালেবান শাসন পুনরুদ্ধারের পর, পশ্চিমা দেশগুলি তাদের মানবাধিকার নীতির প্রতি কঠোর মনোভাব দেখিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিত করেছে।

সিরিয়া, ইরাক ও লিবিয়া ইস্যু: মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিদেশি শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের কারণে কূটনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সিরিয়া, ইরাক, এবং লিবিয়ার সংকটের সময়, যেখানে পশ্চিমা দেশগুলি বিভিন্ন সরকার বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সমর্থন জানিয়েছে।

৪. সেনা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:

কিছু ক্ষেত্রে, বিদেশি শক্তি মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করার চেষ্টা করেছে। এই ধরনের হস্তক্ষেপ কখনো সেনা আক্রমণের মাধ্যমে, কখনো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে বিদেশি হস্তক্ষেপ: ইরাকের তেল সম্পদ এবং আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদ শোষণ করতে পশ্চিমি দেশগুলি সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সেনা হস্তক্ষেপ করেছে। এই ধরনের হস্তক্ষেপ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতির উপর স্থায়ী ক্ষতি করেছে এবং তাদের সম্পদের শোষণ সম্ভব করেছে।

৫. উন্নয়ন সহায়তা ও অর্থনৈতিক নির্ভরতা:

বিভিন্ন মুসলিম দেশ উন্নয়ন সহায়তা গ্রহণ করে থাকে, যা কার্যত একটি নতুন ধরনের শোষণ তৈরি করে। এই সহায়তা প্র often একটি শর্তসাপেক্ষ প্রক্রিয়া, যেখানে মুসলিম দেশগুলোকে পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং কূটনৈতিক স্বার্থের প্রতি অনুগত থাকতে হয়।

স্বাধীনতার অভাব: মুসলিম দেশগুলো যেগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, তারা প্রায়ই তাদের ন্যায্য মূল্য পায় না এবং বিনিময়ে তাদের নীতি এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বিদেশি শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৬.বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা:

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য নীতিতে মুসলিম দেশগুলোকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং তাদের পণ্য সঠিক মূল্য পায় না। অনেক সময় মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতির ক্রমাগত শোষণ করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিগুলি গঠিত হয়

অর্থনৈতিক অপতৎপরতার প্রভাব:

মুসলিম দেশগুলোর আর্থিক স্থিতিশীলতা
নষ্ট হয়।

#স্থানীয় শিল্প ও কৃষিখাত দুর্বল হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম দেশগুলোর প্রভাব কমে যায়।

সমাজে দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অসমতা বাড়ে।

গণমাধ্যমে অপতৎপরতা

অমুসলিম গণমাধ্যম ও ইসলামবিরোধী প্রচারণা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। অনেক অমুসলিম গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম ইসলামফোবিয়া ছড়ানোর জন্য মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদ এবং নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করা হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

১.ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার:

গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বিষয়ে নেতিবাচক প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামবিরোধী ধারণার বিস্তার ঘটে। মুসলিমদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করা হয়। এতে বিশেষভাবে মুসলিমদের "সন্ত্রাসী", "জঙ্গি" বা "সহিংস" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

নেগেটিভ স্টেরিওটাইপ: পশ্চিমা গণমাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশন, সিনেমা এবং খবরের চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরা হয়। মুসলিমদের নানা ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের ধর্মের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এবং সন্ত্রাসী হামলাগুলোকে ইসলাম এবং মুসলিমদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করা হয়।

সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলিমদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা: যখনই কোনো সন্ত্রাসী হামলা ঘটে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে, তখন প্রায়ই সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম মুসলিম

হওয়া সত্ত্বেও, পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে ওই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এটা মুসলিমদের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২. গণমাধ্যমের ভুল উপস্থাপন:

গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের ভুল উপস্থাপনা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বা বৈষম্যের পরিস্থিতি তৈরি করে।

সংবাদ মাধ্যমে মিথ্যা বা অপমানজনক প্রতিবেদন: অনেক সময়, বিশেষ করে কিছু ঘটনার পরে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিষয়ে ভুল, অসম্পূর্ণ বা অপমানজনক তথ্য প্রচার করা হয়। এই ধরনের প্রতিবেদনগুলি সমাজে মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম ও মুসলিমদের ভ্রান্তভাবে "অনৈতিক", "প্রতিরোধযোগ্য" বা "রক্ষণশীল" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার: গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে নেগেটিভ ভাষা ব্যবহার করে তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়। এটা বিশেষ করে ইসলামোফোবিক বা ইসলাম বিদ্বেষী ভাষার মাধ্যমে ঘটে, যা মানুষের মনে মুসলিমদের প্রতি ভীতি তৈরি করে।

৩. সন্ত্রাসবাদ এবং মুসলিমদের সংযুক্ত করা:

অমুসলিম গণমাধ্যমগুলো সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক তৈরি করে, এবং মুসলিমদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করে।

সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক: কিছু ইসলামী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, যেমন আল-কায়দা, আইএস, বা তালেবান, তাদের কার্যক্রমের জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করে। এর ফলে গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখানো হয়।

প্রোফাইলিং এবং বৈষম্য: মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা বা মুসলিমদের আক্রমণাত্মক বা সহিংস হিসেবে প্রোফাইল করা হয়ে থাকে। সংবাদ মাধ্যমের এসব দৃষ্টিকোণ মুসলিমদের সমাজে ভয় এবং বৈষম্যের শিকার করে তোলে।

৪. ইসলামের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি:

গণমাধ্যমের মাধ্যমে মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা সমাজে ইসলামোফোবিয়া ইসলাম-বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে সহায়ক হয়। মুসলিমরা সমাজে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে থাকে, যেখানে তাদের ধর্ম এবং বিশ্বাসের প্রতি তীব্র নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা হয়।

সামাজিক বৈষম্য: গণমাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিক বর্ণনা সমাজে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করে। মুসলিমরা সমাজে প্রান্তিক হয়ে যায় এবং তাদের ধর্মীয় চর্চা বা সংস্কৃতিকে অসম্মান করা হয়।

পলিটিক্যাল কার্টুন এবং প্রতিবেদন: গণমাধ্যমে ইসলামোফোবিক কার্টুন, প্রতিবেদন এবং কথোপকথন দ্বারা মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও অনাস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই ধরনের পরিবেশে মুসলিমরা তাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য বা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

৫. মুসলিম বিশ্বে সংঘাত ও বিভাজন সৃষ্টি:

গণমাধ্যমের অপতৎপরতার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়, যা ইসলামোফোবিক ধারণার বিস্তার ঘটায়।

মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ তুলে ধরা: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত এবং যুদ্ধের খবর প্রচার করা হয় যা মুসলিম বিশ্বকে অস্থিতিশীল এবং সহিংস হিসেবে উপস্থাপন করে। এটি মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন এবং সংঘাতের ধারণা তৈরি করে এবং পশ্চিমা বিশ্বকে "শান্তির রক্ষক" হিসেবে উপস্থাপন করে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রায়ণ: মুসলিম সমাজের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সামাজিক উন্নয়ন বা সফলতা তুলে না ধরে বরং তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সহিংসতা বা গৌরবহীন দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৬. ইসলামের প্রামাণিকতা ও শান্তির বার্তা উপেক্ষা:

গণমাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বার্তা, যা শান্তি, সহিষ্ণুতা, এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দেয়, তা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। এতে মুসলিমদের ধর্মের প্রতি ভুল ধারণা তৈরি হয় এবং ইসলামকে শুধু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত **বিভিন্ন সমাজে অমুসলিমদের অপতৎপরতার চিত্র**

রাজনৈতিক বক্তৃতায় মুসলিম বিরোধিতা: পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা অনেক সময় ইসলামোফোবিক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। যেমন, মুসলিম অভিবাসীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এবং চাকরির বাজারে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা।

ইসলামের ধর্মীয় চর্চা ও সংস্কৃতির প্রতি আক্রমণ: মুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক যেমন হিজাব, নেকাব, এবং ইসলামিক জীবনধারার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়ানো হয়। কখনও কখনও এই সংস্কৃতিগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যেমন ফ্রান্সে

হিজাব নিষিদ্ধ করা বা অন্যান্য পশ্চিমা দেশে মুসলিমদের ধর্মীয় চর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

এশীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অমুসলিমদের অপতৎপরতা:

এশীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের অপতৎপরতা দেখা যায়, তবে এখানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলি কিছুটা আলাদা।

ভারত: ভারতে বর্তমানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা একটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বিশেষত, ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করছে। এই গোষ্ঠীগুলি মুসলিমদের "অন্য" হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করে দেখে।

গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার: ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই অপপ্রচারের মধ্যে থাকতে পারে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, এবং তাদের ধর্মীয় চর্চাকে আক্রমণ করা।

হিন্দু-মুসলিম সহিংসতা: সম্প্রতি ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অনেক বেড়ে গেছে। গণপিটুনির মতো ঘটনার মাধ্যমে মুসলিমদের উপর আক্রমণ এবং হত্যার ঘটনা ঘটছে। এটি একটি বড় ধরনের অপতৎপরতার চিত্র, যেখানে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পরিচয়কে লক্ষ্য করে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানো হচ্ছে।

চীনে মুসলিমদের প্রতি অপতৎপরতা:

চীনে, বিশেষত শিনজিয়াং অঞ্চলে, মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপতৎপরতা চলছে। চীনের সরকার উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়কে নিপীড়ন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে।

ডিটেনশন ক্যাম্প: চীন সরকারের পক্ষ থেকে শিনজিয়াং অঞ্চলে উইঘুর মুসলিমদের 'পুনঃশিক্ষা' ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে, যেখানে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করা: উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন তারা যাতে ইসলামের পাঁচটি রুকন পালন করতে না পারে বা নিজস্ব ধর্মীয় পোশাক পরতে না পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির অপতৎপরতা:

মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি শক্তিগুলোর প্রভাবও মুসলিম সমাজে অপতৎপরতা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক চাপ মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে, যা তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনে বিদেশি হস্তক্ষেপ: মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিদেশি শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং সহিংসতা বেড়েছে। এসব দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ মুসলিম সমাজের মধ্যে অস্থিরতা এবং বিভাজন সৃষ্টি করছে।

মুসলিম ব্রাদারহুড এবং শিয়া-সুন্নী বিরোধ: মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের মধ্যে শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা তাদের একতা এবং শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইসলামের আলোকে অপতৎপরতার বৈশিষ্ট্য

ইসলামের আলোকে অপতৎপরতা (fitnah) এমন একটি শব্দ, যা মূলত বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, ক্ষতি বা বিপর্যয় সৃষ্টির অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মে অপতৎপরতা অত্যন্ত গর্হিত এবং নিষিদ্ধ একটি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এটি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মানুষের শান্তি ও একতা নষ্ট করে। ইসলামে অপতৎপরতার বৈশিষ্ট্য এবং এর বিরুদ্ধে সতর্কতার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

১. বিভ্রান্তি সৃষ্টি :

ইসলামে অপতৎপরতা এমন সব কাজকে নির্দেশ করে, যা সমাজে বিভ্রান্তি, অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এটি মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বৈষম্য এবং ঝগড়া সৃষ্টি করতে পারে, যা সমাজে শান্তি বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন:

মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা: ইসলাম খুবই গুরুত্ব দেয় মুসলিমদের একতা এবং সহিষ্ণুতা বজায় রাখার উপর। অপতৎপরতা মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যেমন শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা।

ধর্মীয় ভ্রান্তি ছড়ানো: ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা বা আকিদা সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা অপতৎপরতা। এটি সাধারণত মিথ্যা তথ্য, গুজব বা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে করা হয়।

২. সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা:

ইসলামে অপতৎপরতা এমন কাজকেও বোঝায় যা সত্য, ন্যায় এবং নৈতিকতা বিরোধী। এটি সাধারাণত মানুষের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ:

ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আক্রমণ: ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, যেমন আল্লাহর একত্ব, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী, কোরআন এবং হাদিসের প্রতি আক্রমণ অপতৎপরতার অংশ।

অন্যায় বা অবিচার প্রতিষ্ঠা: অপতৎপরতা তখন ঘটে যখন সমাজে অবিচার, দুর্নীতি, অত্যাচার বা শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিরোধ করা হয় না।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নষ্ট করা:

ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা বজায় রাখতে নির্দেশ দেয়। অপতৎপরতা এমন কাজ যা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নষ্ট করে এবং সমাজের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যেমন:

অন্য ধর্মের প্রতি আক্রমণ: মুসলিমদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আক্রমণ করা অপতৎপরতা। এতে মুসলিমরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা: কোনো একটি ধর্মের নামে সমস্ত মানুষকে একে অপরের শত্রু বা অবিশ্বাসী হিসেবে দেখানো, যা সমাজে বিভাজন এবং বিদ্বেষ তৈরি করে।

সামাজিক শান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি:

ইসলামে শান্তি এবং সহমর্মিতার দিকে প্রবণতা থাকে। অপতৎপরতা এমন কাজ যা সমাজে শান্তি ও সুরক্ষা নষ্ট করে। এটি মানুষের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ এবং সহিংসতার বীজ বুনে দেয়। উদাহরণস্বরূপ:

সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি: বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে সমাজে শান্তির পরিবেশ নষ্ট করা।

সহিংসতা এবং মারামারি: অপতৎপরতা একে অপরকে সহিংসতার মাধ্যমে নির্যাতন বা আক্রমণ করতে প্ররোচিত করতে পারে, যা ইসলাম অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

মিথ্যা ও গুজব প্রচার:

ইসলামে মিথ্যা কথা বলা, গুজব ছড়ানো বা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মিথ্যাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ অপতৎপরতার বৈশিষ্ট্য, যা সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে। যেমন:

চরিত্রহনন এবং গুজব: সমাজে মিথ্যা খবর বা গুজব ছড়িয়ে সমাজে বিভ্রান্তি এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করা, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে অশুভভাবে চিত্রিত করা।

ভুয়া অভিযোগ বা কুৎসা: অন্যের চরিত্রে কুৎসা রটানো, যা মানুষের সম্মান এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন করে।

ধর্মীয় বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙা:

ইসলামে সমাজের শৃঙ্খলা এবং আইনকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপতৎপরতা যখন আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তখন তা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ:

আইন অমান্য করা: ইসলামে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অনুসরণ করতে বলা হয়। অপতৎপরতা হচ্ছে আইনের প্রতি অবজ্ঞা বা শৃঙ্খলাহীনতা, যেমন অবৈধ ধর্মীয় গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ।

অনৈতিক কাজ: ইসলামের মৌলিক নীতির বিপরীতে যেকোনো কাজ করা, যেমন মদপান, জুয়া খেলা, বা যৌন অপরাধ, সমাজে অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

অন্যায় প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র:

অপতৎপরতা তখন ঘটে যখন কিছু গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। এটি অন্যদের উপর আক্রমণ করে সমাজে অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে।

পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্র: কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, এবং বিশেষত মুসলিম সমাজে বিভক্তি তৈরির চেষ্টা।

অন্যায় প্রচারণা: অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ বা মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে তাদের মান-সম্মান ক্ষুন্ন করার প্রচেষ্টা।

ইতিহাসের অমুসলিমের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক

অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম

আমাদের জন্য এক মহান ও অনন্য পন্থাও পদ্ধতির সন্ধান দেয়, যে পদ্ধতিতে রাসুল সাঃ স্বীয় বিরুদ্ধচারণকারী ও অসৎ অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ করেছেন। সকলের সাথে রাসুল(সাঃ) এর আচরণ ছিল সম্মান সূচক কোন মানুষকে অন্যভাবে অপদস্ত করা বা কারো প্রতি জুলুম করা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তার মর্যাদা হানি করা বৈধ নয় টাইমে অনেক আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর জীবন চরিত্র থেকে স্পষ্টতা ফুটে উঠেছে

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

বল, ‘আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। এটা এই : ‘তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না।’ তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।—আল আনআম - ১৫১

সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ এবং মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন । সাহল ইবনে হুনাইব (রাঃ)কায়েস ইবনে সাদ (রাঃ) কাদেসিয়ায় বসা ছিলেন। তখন তার পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের বলা হল লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন মহানবী(সাঃ) এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।তাঁকে বলা হলো , এটা তো এক ইহুদীর লাশ। তখন তিনি বলেন -”সে কি প্রাণ(মানুষ) নয় “। বুখারি হাদিস ১২৫০

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করে নাই তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

—আল মুম্‌তাহিনাহ্ - ৮

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথে ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্যই কর্তব্য।

ইতিহাসে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকশিত হয়েছে, এবং এটি সাধারণত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে, মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক একে অপরের মধ্যে সহিংসতা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্মান এবং দ্বন্দ্বের মিশ্রণ ছিল। নিচে বিভিন্ন সময়কাল ও পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সম্পর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৭ম শতক):

মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক ইসলামের সূচনালগ্নে একতা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

ইসলামের প্রথম কমিউনিটি: মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বে মদিনা নগরীতে মুসলিমদের এক শক্তিশালী কমিউনিটি গঠিত হয়, যেখানে মুসলিমরা একে অপরকে সহযোগিতা এবং সমর্থন দিয়ে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

হিজরতের মাধ্যমে একতা: মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর, মুসলিমরা উভয় শহরের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মুসলিমরা মিথ্যাচারের শিকার হয়ে একে অপরের প্রতি পরস্পরের সহায়তা প্রদান করতেন।

আল-উহুদ যুদ্ধ (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ): মদিনার মুসলিমদের একত্রিত হয়ে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে সহযোদ্ধাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২. ইসলামিক খিলাফত (৭ম-১৩শ শতক):

ইসলামের বিস্তার, বিশেষত উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ), আব্বাসি (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) এবং ফাতিমি (৯৬০-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) খিলাফতের সময় মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে রাজনৈতিক এবং সামরিক। তবে রাজনৈতিক বিভাজনও দেখা যায়। উমাইয়া ও আব্বাসি যুগ: এই দুই খিলাফতের মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, তবে একে অপরের প্রতি বিরোধিতা এবং প্রতিযোগিতা ছিল। উমাইয়া এবং আব্বাসি খিলাফতের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল, যেমন আব্বাসিদের উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং খিলাফতের জন্য ক্ষমতার সংগ্রাম।

মুসলিম শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পর্ক: মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, ইবেরীয় উপদ্বীপ এবং দক্ষিণ এশিয়াতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে একে অপরের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৩. শিয়া-সুন্নী বিরোধ:

ইসলামের ইতিহাসে শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভেদটি মূলত খিলাফতের পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আলী (রাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী অনুসারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়। কারবালা যুদ্ধ (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ): শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে বিরোধের একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছিল কারবালা যুদ্ধ, যেখানে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এই ঘটনা শিয়া মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি তাদের ইতিহাসে একটি চরম ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

শিয়া সুন্নী বিভেদ: শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, যার ফলস্বরূপ অনেক সময় সংঘর্ষ এবং সহিংসতা দেখা দিয়েছে, যেমন ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮) এবং মধ্যপ্রাচ্যের নানা রাজনৈতিক সংকট।

৪. মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব:

মধ্যযুগে, বিশেষত মঙ্গল আক্রমণ এবং মুসলিম শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সময় মুসলিম সমাজে একাধিক রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি হয়।

মঙ্গল আক্রমণ: ১৩শ শতকের দিকে মঙ্গোলদের আক্রমণ মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি বড় সংকট ছিল। মঙ্গোল বাহিনী মুসলিম শাসকদের রাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে দেয়,

যেমন আব্বাসি খিলাফতকে তারা ভেঙে দেয়। এই সময় মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনি, যার ফলে মঙ্গলদের কাছে পরাজিত হয়।

মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা: বিশেষত উসমানীয়, মুঘল, ফাতিমি, এবং সাফাবিদ সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিযোগিতা ছিল, যা একে অপরের সাথে সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টি করেছিল।

৫. আধুনিক যুগে মুসলিমদের সম্পর্ক:

আধুনিক যুগে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক বেশি বৈশ্বিক এবং জটিল হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা মুসলিম দেশগুলোর উপনিবেশীকরণের পর, মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন, তবে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভাজন প্রায়ই তাদের সম্পর্ককে কঠিন করে তোলে।

আরব-ইসরায়েল সংঘাত: বিশেষ করে আরব বিশ্ব এবং ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত মুসলিমদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। আরব দেশের মধ্যে একতা এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

সামাজিক এবং ধর্মীয় বিভেদ: আধুনিক বিশ্বে মুসলিমরা বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক জায়গায় বৈরী হতে দেখা যায়, বিশেষত ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে।

৬. মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস:

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেমন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC), যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করে। তবে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভাজন এখনও এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৭.মদিনার সনদ (Constitution of Medina) হলো ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ, যা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি মদিনার মুসলিম, ইহুদি ও অন্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি, সমঝোতা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত হয়েছিল।

মদিনার সনদ:

মদিনার সনদ ৫৩ অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি চুক্তি ছিল যা মদিনার সমাজে সকল ধর্মাবলম্বী ও গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল। এটি মদিনার মুসলিম, ইহুদি, এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়দের মধ্যে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক চুক্তি ছিল। মদিনার সনদে মুসলিমদের এবং অমুসলিমদের অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং শান্তির সুরক্ষা বিধান করা হয়েছিল।

এটি মূলত মুসলিম কমিউনিটির সংহতি, নিরাপত্তা, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি আইনসভা হিসেবে কাজ করেছিল।

মদিনার সনদের প্রধান দিকগুলি:

ধর্মীয় স্বাধীনতা:

সনদে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। মুসলিমরা ইসলামের উপর ভিত্তি করে নিজেদের ধর্মীয় অধিকার প্রয়োগ করবে, আর ইহুদি সম্প্রদায়ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখে তাদের ধর্মীয় আইন অনুসরণ করতে পারবে।

"ইহুদিরা তাদের নিজ ধর্মের বিষয়ে স্বাধীন থাকবে" এবং মুসলিমরা তাদের ধর্মে স্বাধীনভাবে উপাসনা করবে, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল।

#সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তা:

সনদে বলা হয়েছিল, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী একে অপরকে সাহায্য করবে এবং রক্ষা করবে। সুতরাং, মদিনার মুসলিম, ইহুদি, ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করবে এবং যদি কোনো গোষ্ঠী আক্রমণের শিকার হয়, তারা একে অপরকে সহায়তা করবে।

মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়কে একই সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুক্তি করা হয়েছিল।

#একতা ও সংহতি:

সনদে বলা হয়েছিল যে, মদিনার বাসিন্দারা এক জাতির মতো থাকবে, এবং একটি বৃহত্তর মদিনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রে কাজ করবে।

তাদের মধ্যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিভাজন বা সংগ্রাম হয়নি এবং একে অপরকে সম্মান দেওয়া হয়েছিল।

আইন ও বিচার:

সনদে আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে সব সম্প্রদায়কে এক সমান বিচার পাওয়া নিশ্চিত করা হয়েছিল। ইসলামী শরিয়াহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে।

মুসলিমদের জন্য দায়িত্ব:

মুসলিমদের একটি দায়িত্বও ছিল, যার মধ্যে ছিল একে অপরকে সাহায্য করা, ধর্মীয় বিশ্বাসের সুরক্ষা করা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে মদদ না করা।

মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, যে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করবে।

আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার উদাহরণ:

মদিনার সনদে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার মূল উদাহরণ দেখানো হয়েছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো:

1. ইহুদি সম্প্রদায় ও মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতা:

মদিনার সনদে ইহুদিদের সঙ্গে মুসলিমদের একত্রে বসবাসের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কর্মকা- পরিচালনা করার সুযোগ ছিল।

যদি কোনো ইহুদি বা মুসলিম গোষ্ঠী অন্যের ওপর আক্রমণ করত, তবে তারা একে অপরকে রক্ষা করার জন্য চুক্তি করেছিল।

2. মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা:

মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করতে পারত, এবং ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করতে পারত।

এটি ছিল একধরণের আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের চূড়ান্ত উদাহরণ, যেখানে মুসলিমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেয়নি এবং এর বদলে সম্মান ও সহযোগিতা প্রদান করেছে।

3. শান্তিপূর্ণ সমঝোতা:

মদিনার সনদে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যাতে ইসলাম, ইহুদিসম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং সামাজিক শান্তি স্থাপিত হয়।

সনদে একে অপরকে আঘাত বা বিপদ না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, এবং একত্রে যেকোনো ধরনের সংকট বা শত্রুতা মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

4. মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রশংসা:

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অধিকার সুরক্ষিত রাখার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন এবং এটি ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রতিফল।

অধ্যায় ৪-ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের করণীয়

ইহুদি শবদৈেেেেেেেেেেেো

ইসলামের নীতিমালায় অমুসলিমদের প্রতি আচরণ নির্ধারণের বিষয়টি ইসলামী শরিয়াহ এবং কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি ন্যায্য, সহনশীল এবং মানবিক আচরণে বিশ্বাস করে, তবে একে সরাসরি "অমুসলিমদের প্রতি ইসলাম কীভাবে আচরণ করতে বলে" বা "ইসলামের নীতিমালা" বলা যেতে পারে।

ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা

এখানে ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনতা:

ইসলামে সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুত্ব রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সঠিক পথ এবং ভুল পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে।" (কুরআন ২:২৫৬)

ইসলাম অমুসলিমদের তাদের ধর্ম পালন করতে বাধা দেয় না। তারা তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে, যদিও মুসলিমদের জন্য ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে বিবেচিত।

২. অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক:

ইসলামে অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ এবং সহনশীল আচরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে না, তোমরা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।" (কুরআন ৬০:৮)
ইসলামের দৃষ্টিতে, অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত, যতক্ষণ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা অন্যায় আচরণ না করে।
৩. অমুসলিমদের জন্য বিশেষ অধিকার:
ইসলামে, বিশেষত যাদেরকে আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিষ্টান) বলা হয়, তাদের বিশেষ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাদের সাথে জিজিয়া কর (এক ধরনের কর যা আহলে কিতাবদের উপর আরোপিত ছিল) গ্রহণ করা হত, এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখা হতো। তবে, এই কর প্রবর্তন করার পিছনে লক্ষ্য ছিল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা, এবং এটি অন্যায় নয়।
কুরআনে বলা হয়েছে: "আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং তার অন্তীম দিনে বিশ্বাস করে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্য কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না।" (কুরআন ৫:৬৯
৪. অমুসলিমদের প্রতি খোলামেলা দাওয়াত (Islamic Call to Islam):
ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি দাওয়াত (ইসলাম গ্রহণের আহ্বান) দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করে। তবে, কুরআন ও হাদিসে এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তন কোনোভাবে জোর করে বা চাপ দিয়ে করতে হবে না:
"তুমি কি মানুষকে তোমার পথে জোর করে টেনে আনতে চাও, যদিও তারা বিশ্বাসী নয়?" (কুরআন ১০:৯৯)
ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামিক দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করে, যাতে তারা যুক্তি ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে
৫. অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা:
যদি কোনো অমুসলিম গোষ্ঠী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে ইসলামের নীতি অনুসারে, মুসলিমরা তাদের প্রতিরক্ষা করার অধিকারী। তবে, এই প্রতিরক্ষা অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে, যাতে নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করবে না। আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।" (কুরআন ২:১৯০)

৬. মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের স্থান:

ইসলামে অমুসলিমদের মুসলিম সমাজে সহ-অস্তিত্বের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে। একদিকে, মুসলিমদের তাদের ধর্মের প্রতি অনুগত থাকতে হবে, তবে অন্যদিকে অমুসলিমদেরও তাদের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। মদিনার সনদ (Constitution of Medina) এ বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ, যেখানে মুসলিমরা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা মিলে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস এবং সহযোগিতা করেছিল।

৭. ইসলামে মানবাধিকার:

ইসলামে মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার মধ্যে অমুসলিমদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে: "অবশ্যই, আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিইনি।" (কুরআন ৪৯:১৩)

নবী করিম সাঃ এর অমুসলিমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে জাতি, ধর্ম, বা বর্ণের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই; সব মানুষের সম্মান এবং অধিকার সুরক্ষিত।

১. নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধৈর্য ও বিচক্ষণতা:

মক্কার আক্রমণ ও নির্যাতন:

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কায় ইসলামের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাকে এবং তার অনুসারীদের ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ধৈর্য্য ধারণ করেন এবং কখনও অযথা উত্তেজিত হননি। তিনি সন্ত্রাসী বা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে শান্তির পথে চলতে থাকেন।

মক্কার কুরাইশরা নবী (সাঃ)-কে নানা ভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, যেমন তারা তাকে বিভিন্নভাবে অপমানিত করেছিল, তার অনুসারীদের নির্যাতন করেছিল।

কিন্তু নবী (সাঃ) সবসময় ধৈর্য ধারণ করে তাদের অপপ্রচারে প্রতিক্রিয়া জানাননি, বরং তাদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি উদাহরণ হলো, যখন নবী (সাঃ) মক্কায় একটি বসবাসযোগ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, তখনও তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালালেও তিনি কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাননি। মক্কার শত্রুদের প্রতি কৃপণতা না করে তিনি শান্তিপূর্ণ পথেই ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন।

মদিনায় হিজরত:

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পরেও, নবী (সাঃ) কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন, কিন্তু তার ধৈর্য এবং বিচক্ষণতা তাকে সাহায্য করেছিল। মদিনায় তার নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর, তিনি একদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যদিকে মদিনার বিভিন্ন ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাঁর এ বিচক্ষণতা মদিনার সনদে (Constitution of Medina) স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২. সাহাবিরা এবং ধৈর্য:

নবী (সাঃ)-এর সাহাবিরাও তার অনুসরণ করে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামের অপপ্রচার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তারা যখন বিভিন্ন যুদ্ধ বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারা ধৈর্য ধরে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কখনোই আবেগ বা উত্তেজনায় নেতৃত্ব দেননি।

যুদ্ধে ধৈর্য:

যুদ্ধ উহুদ (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)-এ মুসলিমরা প্রথমে বিজয়ী হলেও, পরে শত্রুরা পুনরায় আক্রমণ করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সঠিক সিদ্ধান্ত নেন এবং যুদ্ধে তাদের ধৈর্য এবং সংযম প্রদর্শন করে।

যুদ্ধ বদর (৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এ মুসলিমরা খুবই কম সংখ্যক সত্ত্বেও, তাদের দৃঢ় মনোবল এবং ধৈর্যের মাধ্যমে বিজয়ী হয়।

৩. কুরআন ও হাদিসের শিক্ষায় ধৈর্য:

কুরআনে এবং হাদিসে ধৈর্য ধারণের বিষয়ে বিভিন্ন বাণী পাওয়া যায়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, বিপদ বা প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে একজন মুসলিমকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, এবং সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"হে যারা বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (কুরআন ২:১৫৩) এছাড়া, হাদিসে নবী (সাঃ) বলেছেন: "ধৈর্য হ'ল বিশ্বাসের আধার।" (সহীহ মুসলিম)

৪. বিচক্ষণতার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত:

ইসলামের অপপ্রচার মোকাবিলায়, মুসলিমরা তাদের বিচক্ষণতা ব্যবহার করেছেন। তারা কখনও উত্তেজনা বা অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষে না জড়িয়ে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন।

নবী (সাঃ) এবং তার সাহাবিরা মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছিলেন এবং ইসলামি নীতির প্রচার করার ক্ষেত্রে অযথা বিরোধ বা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতেন। তারা যেখানেই ইসলাম প্রচার করতেন, সেখানে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতেন এবং সবার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

কুরআনে উল্লেখ রয়েছে: "তুমি তাদের সাথে যে কোন বিষয়ে বিতর্ক করবে, তা হবে সদ্ভাবে, সেরা কৌশল দিয়ে এবং সদাচরণসহ।" (কুরআন ১৬:১২৫)

৮.মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য এবং বিচক্ষণতা:

ইসলামের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে ঐক্য ও সামর্থ্য বজায় রাখতে ধৈর্য ও বিচক্ষণতা অপরিহার্য ছিল। মক্কা ও মদিনায় ইসলামের প্রথম দিনগুলির মতো, মুসলিমরা তাদের ধৈর্য ও বিচক্ষণতা ধরে রেখে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং ঈমান বজায় রেখেছিল।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অপপ্রচার মোকাবেলায় মুসলিমরা কখনও একে অপরকে আলাদা করেনি বা বিভক্ত হয়নি। তাদের মধ্যে ঐক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একমাত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর সঠিক পথ প্রদর্শন করা।

মুসলিম উম্মাহ:

ইসলামিক ঐক্যের ধারণা উম্মাহ বা মুসলিম সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত। কুরআনে বলা হয়েছে: "এই উম্মাহ তোমাদের জন্য উত্তম উম্মাহ, তোমরা সত্যের প্রতি আহ্বান জানাও, মন্দ থেকে বিরত থাকতে বলো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো।" (কুরআন ৩:১ 1 O)

এর মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহকে সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে একত্রে কাজ করতে হবে, যাতে তারা মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

৯.ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামিক সমাজের উন্নয়ন:

ইসলামে ঐক্য শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একত্রে কাজ করলে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি গড়ে তুলতে পারেন, যা একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা: ইসলামী সমাজে একে অপরকে সাহায্য করা, দান-খয়রাত করা এবং দরিদ্রদের সহায়তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের ঐক্য সমাজে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক ঐক্য: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ, যেন তারা একসাথে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে এবং মুসলিম বিশ্বের উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে।

৯. ঐক্যের শত্রুদের বিরুদ্ধে সচেতনতা:

ইসলামে ঐক্যের শত্রুদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

১০. ইসলামের ঐক্য এবং বিশ্ব শান্তি:

ইসলামে ঐক্য শুধু মুসলিম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা তাদের ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামে সন্ত্রাসবাদ এবং হিংসা থেকে বিরত থাকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ তা সমাজের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তথ্য প্রচারে সচেতনতা বৃদ্ধি

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্মের সঠিক প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী অন্যদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়া তৈরি করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম সম্পর্কে

নেতিবাচক বা ভুল ধারণা তৈরি হয় যা সাধারণত অপপ্রচার, অনুশীলনগত অসঙ্গতি, বা অবিলম্বে বাস্তব তথ্যের অভাবের কারণে ঘটে। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেওয়া এবং বৈষম্য দূর করা প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় গ্রন্থ, গবেষণা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব।

১. প্রামানিক তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে ভুল ধারণা দূর করা:

কুরআন এবং হাদিসের বাণী:

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে প্রামানিক উৎস হলো কুরআন এবং হাদিস। কুরআন হল ইসলামের প্রধান গ্রন্থ, এবং এতে ইসলামিক শিক্ষা, নীতি, জীবনযাত্রা এবং সমাজের শৃঙ্খলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। হাদিসও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী ও কাজের সংগ্রহ যা ইসলামিক জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে।

কুরআন ৫:৩২ - "যে ব্যক্তি একটি প্রাণীকে হত্যা করলো, যেন সে সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করেছে, এবং যে একজন মানুষকে বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।"

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে ইসলাম হত্যা বা সহিংসতাকে সমর্থন করে না, এবং শান্তির জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বিভিন্ন গবেষণা ও বই:

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করতে বিভিন্ন গবেষণা এবং ইসলামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত সহায়ক। ইসলামী পণ্ডিতরা অনেক সময় ইসলামিক তত্ত্ব, ইতিহাস, এবং সভ্যতার নানা দিক নিয়ে গবেষণা ও বই প্রকাশ করেছেন যা সঠিক ধারণা প্রদান করে।

বই যেমন: "ইসলাম: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" (Karen Armstrong), "দ্য ইসলামিক রেভুলিউশন" (John L. Esposito) ইত্যাদি বইগুলো ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করতে সহায়ক।

২. বিভিন্ন ভাষায় ইসলামিক গ্রন্থ প্রকাশ:

বিভিন্ন ভাষায় কুরআন এবং ইসলামিক গ্রন্থের অনুবাদ ইসলামের সঠিক বার্তা প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ভাষাভাষী মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনীয়।

কুরআন অনুবাদ:

কুরআনের অনেক অনুবাদ ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত, এবং যেসব ভাষাভাষী মানুষ কুরআন পড়তে পারছে না, তাদের জন্য এই অনুবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। যেমন:

ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, চাইনিজ, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়।

অনুবাদ ও বইয়ের উদাহরণ:

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন"-এর প্রকাশিত কুরআনের বাংলা অনুবাদ (তাফসির সহ)

"পিস বিহাইন্ড দ্য ল্যাংগুয়েজ" (ইংরেজিতে) ইত্যাদি।

এই বইগুলো মূল কুরআন ও ইসলামী মূল্যবোধের সঠিক ব্যাখ্যা এবং ইসলামের শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৩. ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ তথ্য প্রচার:

মাধ্যমের ব্যবহার:

ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম, এবং টেলিভিশন সঠিক ইসলামিক শিক্ষার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ওয়েবসাইট, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল, এবং টিভি চ্যানেল তৈরি করে ইসলামের সঠিক তথ্য প্রদান করা। যা ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে, যেখানে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী শাস্ত্রীয় শিক্ষা পাবেন।

৪. ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা:

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা, ইসলামিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম সম্পর্কে গভীর এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (ভারত), আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিশর), কুয়ালালামপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মালয়েশিয়া) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মুসলিম পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে ইসলাম সম্পর্কে প্রামানিক শিক্ষা দেওয়া হয়, যা সমাজে ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা

মুসলিমদের সংস্কৃতিকে সমন্বয় রাখা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা শান্তি, সহানুভূতি, এবং আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ইসলাম বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং মানুষের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়। মুসলিমদের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং জীবনযাত্রার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদয় সম্পর্ক তৈরি করা ইসলামের আদর্শ অনুসারে একটি মহৎ উদ্দেশ্য।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য:

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতি, ভাষা, এবং সংস্কৃতির লোকদের একত্রিত করেছে। ইসলামে জাতিগত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে কখনো নেতিবাচকভাবে দেখা হয় না, বরং এটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সমঝোতার ওপর জোর দেয়।

কুরআনের শিক্ষা: কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে পুরুষ এবং নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া (ভয় ও শ্রদ্ধা) ধারণ করে।" (কুরআন ৪৯:১৩)

এই আয়াতটি মুসলিমদের মধ্যে একে অপরকে শ্রদ্ধা করার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. মুসলিমদের সংস্কৃতির সমন্বয় রক্ষা:

মুসলিমরা তাদের ঐতিহ্য, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতি বজায় রাখতে পারেন, তবে সেগুলি অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সহনশীল মনোভাব সহ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মুসলিমদের উচিত তাদের সংস্কৃতি বা বিশ্বাস অন্যদের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া, বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংস্কৃতির বৈচিত্র্য:

ইসলামী সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়, যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, ভারতীয়, আরবি, তুর্কি, মালয়, এবং অন্যান্য সংস্কৃতি ইসলামের আলোকে

প্রভাবিত হয়েছে, এবং প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য, শিল্প, সংগীত এবং খাদ্যাভ্যাস রয়েছে।

তবে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, যা সকল সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

৩. আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের উন্নতি:

ইসলাম মুসলিমদের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধার শিক্ষা দেয়। ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক এবং সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুসলিমদের উচিত অন্য ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান এবং সংলাপ করা।কুরআনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আচরণ: কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"তোমরা ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করো না, তবে যারা তোমাদের কাছে পথ প্রদর্শন করেছে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো।" (কুরআন ৩: 64)

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সব মানুষকে একক জাতি হিসেবে সৃষ্টি করতেন, কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা পরস্পরের মাঝে জানাশোনা ও সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।" (কুরআন ৩৫: ২৪)

এই আয়াতগুলো অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সদয় এবং শান্তিপূর্ণ মনোভাব রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, যাতে তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

হাদিসের শিক্ষা:

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন:

"তোমরা যখন কোন অমুসলিমের সঙ্গে কথা বলো, তখন তাদের প্রতি সদয় ও শ্রদ্ধাশীল হও, কারণ তাদের মধ্যেও আল্লাহর সৃষ্টি আছে।" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে, মুসলিমদের উচিত অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা, যাতে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ভুল ধারণা দূর হয়।

৪. ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রসার:

ইসলামিক শিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে মুসলিমরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামিক গ্রন্থের অনুবাদ, ওয়েবসাইট

এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অন্তর্দৃষ্টি এবং সংলাপ:

ইসলামিক কনফারেন্স, সেমিনার এবং সংলাপ - এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি মুসলিমদের এবং অন্য ধর্মের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য সহায়ক হতে পারে। ইসলামের শান্তি ও সহিষ্ণুতার বার্তা তুলে ধরতে, এসব ইভেন্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. সঠিক শিক্ষার প্রচার এবং উন্মুক্ত মনোভাব:

মুসলিমদের উচিত সঠিক শিক্ষা এবং তথ্য প্রচার করা যাতে অন্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দূর হয়। ইসলামের শান্তিপূর্ণ, সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়বিচারের বার্তা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কাছে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ।মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিমরা ইসলামের সঠিক বার্তা এবং শিক্ষার প্রচার করতে পারে, যা ভুল ধারণা দূর করতে সহায়ক হবে। সামাজিক মাধ্যমে "ইসলাম ও শান্তি", "ইসলাম ও মানবাধিকার" সম্পর্কিত পোস্ট, ভিডিও, এবং কন্টেন্ট শেয়ার করা।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও কৌশল

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে মুসলিম বিশ্বের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করে বিশ্বমঞ্চে তাদের আওয়াজ তুলে ধরতে সাহায্য করে। মুসলিম দেশগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। একত্রিত হয়ে তারা যৌথভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বার্তা পৌঁছাতে পারে।

রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়:

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। বিশ্বমঞ্চে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো তাদের দাবিগুলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২. মুসলিম বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সঠিক প্রতিনিধিত্বের পথ:

সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা:

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (OIC): OIC, যা ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তঃধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামিক বিশ্বের সঠিক প্রতিনিধিত্বের একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো নিজেদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে।

ইসলামিক ব্যাংকিং ও অর্থনীতি: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে একত্রিত হওয়া সম্ভব যা মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করবে

সাংস্কৃতিক সংহতি ও সহযোগিতা:

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং একতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এগুলো মুসলিম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ঐক্যবদ্ধ পরিচয় প্রচার করতে সাহায্য করবে এবং মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াবে।

সামরিক সহযোগিতা:

মুসলিম মিলিটারি কোঅপারেশন: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সামরিক সহযোগিতা এবং যৌথ প্রতিরক্ষা উদ্যোগ গড়ে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে, যা তাদের সুরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে। এই ধরনের সহযোগিতা মুসলিম দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং তাদের একতাবদ্ধভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে।

৩. আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে মুসলিম বিশ্বের সঠিক প্রতিনিধিত্ব:

বিশ্ব সংস্থাগুলোর মধ্যে মুসলিমদের উপস্থিতি:

জাতিসংঘ (UN), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা (IMF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। মুসলিম দেশগুলোকে এসব প্ল্যাটফর্মে তাদের স্বার্থ এবং অবস্থান স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের মানবাধিকার এবং শান্তির প্রচার:

মুসলিম দেশগুলোর উচিত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ইসলামের শান্তি, মানবাধিকার, এবং ন্যায়বিচারের বার্তা তুলে ধরা। মুসলিম দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদ তাদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবেমুসলিম দেশগুলো ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং ইসলামিক অবস্থান:

মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একত্রিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা করা উচিত। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কূটনীতি পরিচালনা করলে তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক সুসংহত হবে।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে একযোগিতার প্রচেষ্টা জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৪. মুসলিম দেশগুলোর সমন্বিত উন্নয়ন ও সহযোগিতা:

অর্থনৈতিক সহযোগিতা:

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। এই ব্যাংকটি সদস্য দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যার মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন:

মুসলিম দেশগুলো বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন এবং জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা এও একত্রিত হতে পারে। তাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ পরিবেশ সুরক্ষা এবং পৃথিবীর উন্নয়নের জন্য সহায়ক হতে পারে।

তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত সক্ষম করে তোলা

তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান প্রদান ও আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের দক্ষ করে তোলা আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে, যা মুসলিম সমাজের উন্নয়ন এবং আধুনিক বিশ্বে তাদের শক্তিশালী ভূমিকা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী, সমৃদ্ধ এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

১. তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান প্রদান:

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তরুণদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সঠিক জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহ জাগাতে সাহায্য করবে। ইসলাম শান্তি, ন্যায়, সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার এবং পরিবেশের প্রতি যত্নশীলতার শিক্ষা দেয়।

কুরআন ও হাদীস: কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা তরুণদের মনের গভীরে প্রবাহিত করতে হবে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা তৈরি করতে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, প্রজ্ঞার সঙ্গে হাদীসের শিক্ষাগুলি তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামিক ইতিহাস: ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে তরুণদের জানানো গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত, যা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের সব দিকই অন্তর্ভুক্ত করে।

তরুণদের সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করা:

ইসলামের শিক্ষা তরুণদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, পরোপকারিতা এবং অসহায়দের প্রতি সহানুভূতির ধারণা গড়ে তুলবে। তাদেরকে এইভাবে শেখানো উচিত যে, একজন মুসলিম শুধু নিজেকে নয়, বরং পুরো সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এতে তারা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখতে উৎসাহিত হবে।

আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন:

তরুণদের আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত, প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে এগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের ভূমিকা আরও দৃঢ় করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics): STEM শিক্ষা তরুণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে, যেখানে তারা বিজ্ঞানের মূল ধারণা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বিশেষভাবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন তাদের আরও অনেক নতুন সুযোগ এবং কর্মসংস্থানে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

ইসলামের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়: ইসলামিক শিক্ষার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে যে সব বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মহাবিশ্বের সৃষ্টির গঠন, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবদেহের সৃষ্টি ইত্যাদি, সেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

উদ্যোক্তা মনোভাব ও নতুন উদ্যোগ:

তরুণদের উদ্যোক্তা মনোভাব তৈরি করার জন্য তাদেরকে নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় উৎসাহিত করতে হবে। বিভিন্ন প্রযুক্তি, আর্থিক সেবা, এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলোতে তাদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগের সূচনা করা যেতে পারে।

ডিজিটাল উদ্যোক্তা উদ্যোগ: ডিজিটাল মিডিয়া, ই-কমার্স, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে তরুণদের দক্ষতা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। এমন উদ্যোগ তৈরি করা, যেখানে তরুণরা নিজেদের ব্যবসা গড়তে পারবে, তা সমাজে নতুন সৃজনশীল ধারণা এবং ব্যবসায়িক সমাধান নিয়ে আসবে।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতার উন্নয়ন:

তরুণদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন জরুরি। দক্ষতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা এবং আধুনিক কর্মসংস্থান বাজারের চাহিদা অনুসারে তাদেরকে প্রস্তুত করা উচিত।

প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন: তরুণদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং সার্টিফিকেশন কোর্স আয়োজন করতে হবে, যাতে তারা আধুনিক প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার: বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে তরুণরা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দক্ষতা শিখবে এবং তাদের ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য পাবে।

ইসলামের নৈতিকতা এবং আধুনিক সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা:
ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে আধুনিক সমাজের চাহিদা মেলে এমন জীবনধারা তৈরি করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং জীবনের অন্যান্য দিক ইসলামের নৈতিকতা, সততা, ন্যায্যতা এবং সহিষ্ণুতা সহকারে পরিচালিত হতে হবে।

ইসলামিক নেতৃত্ব: তরুণদের মধ্যে ইসলামিক নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি করা উচিত, যা তাদেরকে সমাজে ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। তাদেরকে সহনশীল, দায়িত্বশীল, এবং ন্যায্যতার প্রতি প্রখর মনোভাবী হতে শেখানো উচিত।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বার্তা:
তরুণরা আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তাই ইসলামিক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানের মেলবন্ধন সামাজিক মিডিয়া, ব্লগ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মুসলিম তরুণরা এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরতে পারে।

তরুণদের সমাজে নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া:
তরুণদের সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করা উচিত, যাতে তারা ইসলামী মূল্যবোধ এবং আধুনিক শিক্ষার মিশেলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশিত হলে, তারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম কমিউনিটির উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং প্রভাব:
তরুণদের আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা উচিত। তারা মুসলিম বিশ্বের ভালো কাজ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারে।

তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান প্রদান এবং আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং সমাজের চাহিদার সাথে যুক্ত করে আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ এবং প্রগতিশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাদেরকে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী

কাজ করতে উৎসাহিত করা গেলে, তারা মুসলিম সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্বেষ কমানো, সহিংসতা এবং সদাচরণ প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়িয়ে সহযোগিতার পথ তৈরি করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী উদ্যোগ, যা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, সমঝোতা এবং সহযোগিতা স্থাপনের জন্য অপরিহার্য। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শান্তি ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি, আচার ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। যখন মানুষ নিজেদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে শেখে, তখন তারা অন্যদের ধর্মকেও সম্মান করতে শুরু করে।

যথাযথ তথ্য প্রদান: ধর্মীয় মতবিরোধের কারণ বেশিরভাগ সময় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই একে অপরকে সঠিকভাবে জানানো এবং বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো শেয়ার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় সংলাপ একে অপরের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। যখন মুসলিম, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের লোকেরা একে অপরের ধর্মীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখে, তখন তারা সহজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা: সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের বিশ্বাস পালন করতে পারে এবং অন্যদের বিশ্বাসেও শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সব ধর্মের মানুষদের মধ্যে বিদ্বেষ কমাতে সাহায্য করবে। বিশেষত, ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ধর্মীয় বৈষম্য, বিদ্বেষ এবং হিংসার পরিবেশ রোধ করা সম্ভব।

সহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি: একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রতিটি ধর্মের পক্ষ থেকে সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

ধর্মীয় সংঘর্ষ ও সহিংসতা বেশিরভাগ সময় ধর্মের প্রতি অজ্ঞতা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে হয়। ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সহিংসতা রোধ করতে সকল ধর্মাবলম্বী একত্রিত হয়ে একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তির জন্য একত্রে কাজ করতে পারে।

সহিংসতার বিরোধিতা: সংলাপে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সবাই সম্মিলিতভাবে সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন।ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে বোঝে এবং নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে পারে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।

বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য: কোনো সংঘর্ষ বা বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হলে, ধর্মীয় নেতারা তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য এবং শান্তির জন্য কাজ করতে পারেন। তাদের এই প্রচেষ্টা তরুণদের কাছে শান্তির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে।

সামাজিক সেবা ও সহযোগিতা: ধর্মীয় সেবা ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে মুসলিম, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী একত্রে মানবিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন, যা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সদাচরণের প্রচার করা যেতে পারে। ইসলামের মতো অন্যান্য ধর্মেও সদাচরণ, সহানুভূতি, দয়া এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই গুণাবলী সবাইকে শিক্ষিত করতে হবে যাতে সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃস্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃস্টবাদপ্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গীর্জা, মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি

ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃস্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃস্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃস্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গীর্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃস্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকী রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার-সার্বিক অর্থেই যত পথ ও পন্থা হতে পারে সব তারা আবিষ্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইহুদি-খৃস্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা; বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য নাক গলায়' তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করছে।

প্রিয় পাঠক, এখন আপনার সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করছি। আশা করি এর দ্বারা আপনি খৃস্টানদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
আন্তর্জাতিক খৃস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃস্টান মিশনারীদের অতীত পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দির প্রথম ২৫ বৎসরে তাদের পরিকান অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কী কীরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারী এই মিশনে অংশগ্রহণ করছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কী দাঁড়াতে

পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার অর্জিনা ভার্সিটির খৃস্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর করার পর মন্তব্য করেন- গবেষণা-পর্যালোচনা সফলতাসহ ভবিষ্যত

'নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃস্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে আবার হতে পারে চিন্তানৈতিকও মনস্তাত্তিক অঙ্গনে। খৃস্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন-শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বৎসর সময়েই খৃস্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (মানে আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীতে যীশু খৃস্টের নামে লেখা বই পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১তে দাঁড়িয়েছে। এগুলের মধ্যে ৫৩০৯৪টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃস্টের নাম লেখা আছে।

ড. বেরিয়েট বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃস্টধর্মের দাওয়াত পৌছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃস্টান রাজ্য সমূহকে 'আলিফ ও বা' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

'আলিফ' দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য যেগুলোতে খৃস্টধর্মের আওয়ায বিলকুল পৌঁছেনি। আর 'বা' দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য যেগুলো খৃস্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগোলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃস্টান রাজ্য সমূহে অনতিবিলম্বে খৃস্টধর্মের দাওয়াত পৌছে দেয়ার জন্য ভৌগোলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান এই ছিলো যে, বর্তমানে অ-খৃস্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বৎসরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯,০০০ নবজাতক শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার

মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল

বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিলো মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃস্টান রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে।

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমান নাস্তিক বা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃস্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। এখন আমরা বাংলাদেশে খৃস্টান মিশনারীদের কর্মফলাফল, গীর্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীর তৎপরতা ও আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে মিশনারীর আগমন

মিশনারী হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে, আজ থেকে পাঁচশত অথবা ছয়শত বছর আগে খৃষ্টান মিশনারীরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারীদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দু'টি দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছয়ায় মিশনারীরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো। এভাবে ১৬২১ খৃস্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-

টান মিশনারীদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

এনজিওদের কার্যক্রম

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও "মৌলবাদী এনজিও", ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান

ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে !

বারিধারা নতুন বাজারের পিছনে একটি বড় বস্তি আছে। একদিন বিকালে বন্ধুবর মাওলানা মুজিব সাহেবসহ ঐ এলাকায় ঘুরছিলাম। চোখের সামনে পড়লো একটি স্কুল, সাথে গির্জা। স্কুলটি দেখে আমাদের কৌতূহল হলো।

স্কুলের সামনে ১০ / ১২ বছর বয়সের কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছে। একজনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে "রাকিবুল ইসলাম" বলে উত্তর দিলো এবং এও জানতে পারলাম যে, সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাকে কালেমা জিজ্ঞাসা করলে "পারি না" বলে উত্তর দেয়। এবার আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললো "জানি না"। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মেরী বা যীশুকে চেনো ? সে উত্তর দিলো – হ্যা, চিনি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – কিভাবে চেনো। সে বললো, আমাদের স্যার আমাদের শিখিয়েছেন।

দেখুন, আমাদের উদাসীনতার সুযোগে আমাদের সন্তানদেরকে তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এটাই হলো তাদের সেবার আসল রূপ।

মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম ?"

তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন ? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান "এনজিও" সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" ২০০০ অ্যালুমনই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে। যেমন –

* নুর-ই-ইলাহী, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,
* খোদার পথ, পোস্টবক্স নং ৫৮, ঢাকা – ১০০০,
* মাসীহী জামাত, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,
* আল হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট,
* ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষার জন্য পোস্টবক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৭ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যবহৃত হয় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কম্পিউটার সেট। তাছাড়া ৩৪০০ রেডিও ও টেলিফোন সেন্টার খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। দেশে বর্তমানে "ঈমানের পথ" নামে ইসলামী আঙ্গিকে রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে।

প্রকাশনা

বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন

প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। **১৬** ই এপ্রিল **১৯৯৮** ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, **১৮৯০** সাল থেকে **১৯১৫** সালের মধ্যে অর্থাৎ **২৫** বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনায় অপকৌশল

ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে **১৯৬৩** সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – **১.** "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – **১.** "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য **১৯৬৮** সালে **১**লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে "জবাজ" নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি "ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া" **৭১** নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার "চৈত্রকল ইউনিয়নে" অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ

ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময় বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী- বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

এ তো হলো একটি ইউনিয়নের প্রতিবেদন, এ ছাড়া কতো ইউনিয়ন গ্রাম রয়েছে, সেখানে যারা এদের মতো বা এদের চেয়ে বেশী আমাদের কাছে সর্বদা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, যা ছিল আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও ঈমানি ফরিযা। পাশে না দাঁড়ানোর ফলে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের পাশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। উচিৎ তো ছিল আমরা তাদের খোঁজ খবর নিবো।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি ? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন – “যে ব্যক্তি পেটপুরে

খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।" অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – "আল্লাহ'র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।" এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ (নোটঃ লেখক "হতভাগ্য উম্মত" লিখেছিলেন, আমি সেটা চেইঞ্জ করে দিয়েছি)। আরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি ? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিনি ? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়াবার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাত।

একটি পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির ঊর্ধ্বে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে ? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোত্থেকে ? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

লোমান তপন, পিতা মরটিন তপন। চকবানারসি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজাতি খৃষ্টান, অর্থাৎ তিনি পূর্বে উপজাতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তিনি জানান, চকবানারসি অঞ্চলে "নিচপাড়া মিশন" এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৫ শত পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। নিচপাড়া মিশনটি এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এটি ইটালিয়ান মিশন। এখানে দুজন ফাদার ও চারজন সিস্টার সার্বক্ষণিকভাবে মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। এ মিশনটি বীরগঞ্জ থানার উত্তরে, প্রায় তিন মেইল ভিতরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিশাল জায়গা নিয়ে এর অফিস ভবন, গির্জা ও মিশনারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরিদানের লোভনীয় টোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, খৃষ্টান মিশনারিগুলোতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে চাকরি মিলে না। চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ভিতরে ভিতরে পুরোদস্তুর খৃষ্টধর্মনিষ্ঠ।

মুসলমান ছেলে-সন্তানদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারিগুলোতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের মুসলমান সন্তানরা নিয়মিত মিশনে যাতায়াত করছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মে খৃষ্টানিজম মানসিকতা গড়ে উঠছে। (বীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে লুথারেন মিশনের প্রতিবেশী)। এ তো ছিল থানার প্রতিবেদন, তারপরেও এটি হলো আজ থেকে প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে। এখন একটু অনুমান করুন, এই সাত / আট বছরে পরিস্থিতি কীরূপ হতে পারে। এই অধমের জন্মও সেই বীরগঞ্জ থানায়, তাই প্রায়ই তাদের সামনাসামনি হতে হয়। এক সময় দেখতাম, আমাদের (_?_) এলাকার সাঁওতালরা ধানক্ষেত ও জঙ্গল থেকে ইঁদুর ও শিয়াল ধরে খেতো আর সাধারণভাবে চলাফেরা করতো। আমরা যেহেতু তাদের কাছে যাইনি, তাদের পাশে দাড়াইনি, ফলে ভিন দেশ থেকে লাল চামড়ার লোকেরা তাদেরকে শিক্ষিত বানিয়েছে। একদিন এক সাঁওতাল ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো, সে গর্বের সাথে বলছিলো – আমাদের অমুক ডাক্তার খৃষ্টান, আমাদের অমুক অফিসার খৃষ্টান।

এই তো এই বছরের শুরুর দিকে একদিন বীরগঞ্জ উপজেলার শহর থেকে ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলাম। মেইন রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ছোট ছোট মাটির ঘরের এক বিস্তীর্ণ মহল্লা। মহল্লাটি সাঁওতালদের। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে মহল্লার মাঝে নতুন একটি ঘর, সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুতে ঠেক দিয়ে কি যেন বলছে, আমার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি, যদিও আমার যাতায়াত সাধারণত এ পথেই হয়ে থাকে। ভ্যানগাড়ি থামিয়ে সেখানে গেলাম আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি হচ্ছে। লোকটি উত্তরে বললো – উপাসনা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন করলাম – কিসের উপাসনা। সে বললো – ক্যাথলিকদের উপাসনা। ক্যাথলিক ! ক্যাথলিক তো খৃষ্টান। সে বললো – আমরাও তো খৃষ্টান। আমি বললাম – আপনারা তো খৃষ্টান ছিলেন না, আপনারা তো সাঁওতাল। কতদিন আগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন ? জবাবে বললো – এই তো কয়েকদিন হলো। কেন খৃষ্টান হলেন ? বললো – তারা আমাদের ঋণ প্রদান করে, আমাদের কাছে আসে। আমি সেই লোকটিকে বুঝালাম আর ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিলাম। সে উত্তরে বললো – আপনি তো আগে আসেননি, আগে বললে আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করতাম, এখন সম্ভব না। কারণ আমাদের গোষ্ঠীর সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি মুসলমান হলে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এ তো ছিল সাঁওতাল বস্তির কথা। এমন আরো যে কতো মুসলিম পরিবারকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে, তা কি আমরা খবর রাখি ?

আমার বন্ধু মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে বলছিলেন, আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ কারিতাসের দাওয়াতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তা কি খবর রাখেন ? তিনি আরো বললেন – আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এদের কয়েকজন খৃষ্টান নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে, খৃষ্টান বলে প্রকাশ করে না।

রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গির চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হুজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি ? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হুজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি ?আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল

সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি "ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা" এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।

২০০৯ সালে এক সফরে লালমনিরহাটের আদিতমারি থানায় যাই। সেখানে যাওয়ার পর এলাকার মানুষ জানালো যে, আমাদের এলাকায় একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমআর খুতবায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহবে আরো বলেন, কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন ঘটবে। তখন তো তাকে মানতে হবেই। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায় ? আরো বলেন – মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম ? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম ইত্যাদি। আমরা যখন খতীব সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম, জানা গেলো তিনি আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হলো খৃষ্টান মিশনারির ছদ্মবেশী একটি সংস্থা। সেবার আবরণের খৃষ্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে সেকান্দার মাস্টার নামে আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি একটি মসজিদের সভাপতি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের উপর উত্থাপিত খৃষ্টানদের শিখানো বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেগুলো দিয়ে তারা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত করে থাকে।

ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগবান গড় গ্রামের (শৈলকূপা থানা ঝিনাইদহ) সফরের কথা বলি। এ সফরে আমাদের রাহবার ছিলেন স্থানীয় কলেজের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম ভাই। গিয়ে দেখি সেখানের অনেক মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত স্থানীয় ঠাণ্ডামাতবর, এলাহী বখশ, বাদশা মিয়া আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিলো। এক পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুনাজারার (বিতর্কের) রূপ নেয়, তবে তারা মুনাজারায় পরাজিত হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী তাদের একজন দাঈ "অমুল মাধুর্য" এর (যে ঐ এলাকায় ইয়াং সোসাইটির প্রধান) সাথে আমার খাতির জমে যায়। আমি তার দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা বই পুস্তক বিলি করি, বুঝাই আর আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে দাওয়াত দেই। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, আপনারা বই পুস্তকের টাকা পয়সা কোথায় পান ? উত্তরে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই আয়ের এক দশমাংশ আল্লাহ'র রাস্তায় দান করি এবং দান করার পর সেদিকে ফিরেও তাকাই না। কেউ আমাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকেও এই দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের দাওয়াতি কাজের অর্থযোগান এভাবেই হয়। আর এভাবে সংগৃহীত টাকা দিয়েই আমরা বই পুস্তক কিনি আর বিতরণ করি। আমূল মাধুর্য জানালেন, তিনি একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে মুসলমানের সন্তানরাও পড়াশুনা করে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা নয় বরং খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়। সেকুলার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। তিনি এ ধরনের বহু তথ্য দিলেন।

আমি মুসলিম ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কয়দিন কয়টি বই আমার প্রতিবেশী অমুসলিমের হাতে তুলে দিয়েছি ? আমরা কতোভাবে আমাদের টাকা খরচ করি, একটি টাকাও কি অমুসলিম ভাইদের পিছনে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে খরচ করেছি ?

মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ

খবর পেলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ অঞ্চলে সফর করি। প্রথমে মেলান্দহ জামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে সম্মানিত মুহতামিম, মুফতি শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা উভয়ে

মাদারগঞ্জ থানার তেঘুরিয়া ইউনিয়নের কয়লাকান্দি গ্রামে পৌঁছি। সেখানে মুসলমানদের এলাকায় ন্যাজরিয়ান মিশনের একটি বিশাল গির্জা দেখতে পেলাম। ঐ এলাকার অনেক মুসলমানই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার দাওয়াত দেই। অনেকে বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস ফেরত দিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন এবং তাওবা করেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্য অনুভূতিও আমাদের হয় না।

মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান

৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে মাদারগঞ্জের তেঘুরিয়া ইউনিয়নে আমাদের সফর হয়। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় এক খৃষ্টান হাফেজ .... এসে আমাকে বললেন, আমাদের এখানকার প্রবীণ / মুরব্বী (যিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান) আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। তখন আমি অধম, বন্ধুবর মাওলানা নুরুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি জালাল সাহেব আসন দিয়ে বসে আছেন। সামনে বিছানার উপর ছড়ানো পবিত্র কুরআন, যেন এ কোন সাধারণ বই-খাতা ! আর ডায়েরি দেখে তাতে কি যেন দাগাচ্ছেন। আমরা সালাম দিয়ে প্রথমে কুরআন শরীফটি বিছানা থেকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো। তার আলোচনার বিষয় ছিল মিশনারিগুলোর শিখিয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো। আমরা তার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে লাগলাম, তিনি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বস (খৃষ্টান মিশনারিদের প্রধান) জাহাঙ্গীর আলম ওরফে লেবু ডাক্তারকে ফোন করলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমাতুল কুরআন, কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কিছু নোট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের পর বললাম, তর্ক কিংবা বিতর্ক কোনটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আপনার প্রতি আহবান থাকবে, পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসবেন।

খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত

হালুয়া ঘাটের এক চার্চে ফাদারের সাথে আমরা কয়েকজন দেখা করি। প্রথমে তাকে সালাম দিলাম।

যুবায়েরঃ আসসালামু আলা মানাত্তিবাআল হুদা।

ফাদারঃ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

যুবায়েরঃ কেমন আছেন ?

ফাদারঃ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ?

যুবায়েরঃ আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আমরা আপনাদের চার্চ দেখতে এসেছি, দেখতে পারি কি ?

ফাদারঃ হ্যা, অবশ্যই দেখতে পারেন।

যুবায়েরঃ (চার্চ দেখতে দেখতে কিছু দাওয়াত) ফাদার সাহেব, দেখুন, আমাদের সমাজে একটি বড় ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো, আমরা যখন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান ভাইদের দেখি, তাকে বিধর্মী মনে করে তার থেকে দূরে থাকি। হিন্দু খৃষ্টান ভাইরাও তাই করে। আসলে এমন করা ঠিক নয়। আমরা সকলেই মানুষ। আপনার কপালে লেখা নেই যে, আপনি খৃষ্টান। তদ্রূপ আমার কপালেও মুসলমান লেখা নেই। আমার চামড়া কাটলে রক্ত লাল হবে, আপনার চামড়া কাটলেও তাই। এর ব্যত্যয় হবে না। মূলত এই পার্থক্য আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। আমাদের মালিক কোন পার্থক্য করেননি। আমাদের প্রভু আল্লাহ সকলকে লক্ষ্য করে বলেন – "হে মানুষ সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ......" এখানে মালিক কোন ভাগ করেননি। এই মালিক এক, তার সাথে কোন শরীক নেই।

ফাদারঃ হ্যা, হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাইবেলেও তা আছে।

যুবায়েরঃ দেখুন, আমাদের মাঝে আরেকটি ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো – হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাদের নবী ? যদিও আপনারা তাকে মুসলমানদের নবী আর আমরা আমাদের নবী বলি। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে – তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। সুতরাং কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। তাই আপনাকে আহবান করবো তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনবেন এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করবেন।

ফাদারঃ আমার অনেক ইচ্ছা যে, কুরআন শরীফ পড়বো। একবার কুরআন শরীফ কিনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খৃষ্টান হওয়ায় আমার কাছে কুরআন শরীফ বিক্রি করেনি।

যুবায়েরঃ আমি আপনার কাছে একটি কুরআন শরীফ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ। আজকে আসি। আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশে খৃষ্টানদের ৬ টি ধর্মপ্রদেশ

বাংলাদেশে খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে পুরো দেশকে ৬ টি প্রদেশে বিভক্ত করেছে। যথা – (১) দিনাজপুর, (২) রাজশাহী, (৩) খুলনা, (৪) চট্টগ্রাম, (৫) ঢাকা, (৬) ময়মনসিংহ।

নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য

দৈনিক করতোয়ার ২১ এপ্রিল ২০০৮ এর একটি সংবাদ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো –

জলঢাকা প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুটামারা, কৈমারী, বালাগ্রাম, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ী, কিশোরগঞ্জের পুটিমারী ও বড়ভিটার হিন্দুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মেগা ফেলোশিপ চার্চ ও ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চসহ ৫ টি সংগঠন নগদ অর্থ, চাল, ডাল, শিক্ষা সহায়তা ও ঋণ প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ জোরে-শোরে চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এলাকাজুড়ে অফিস, উপাসনালয় ও শিশুদের জন্য স্কুল। শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরালে স্কুলগুলোতে চালানো হয় বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ। আর প্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলে। ওমেগা ফেলোশীপ চার্চ এনজিওর নামে গ্রামের অভাবী লোকদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার কথা বলে তাদের তৈরি স্কুল ও অফিসগুলোতে নিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল খুটামারা ইউনিয়নের ২০ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ; পুটিমারী, কচুকাটা ও পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১৮ জন; বড় ভিটা ও কৈমারী ইউনিয়নের ১০ জন মহিলা ও পুরুষের অভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওমেগা ফেলোশীপ চার্চের কথা বলে দিনাজপুর, বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মিশন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেখানে গিয়ে খৃষ্টান বানানোর কথা জানতে পারার পর এলাকার মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। পরে ঐ ইউপির চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র দেব শর্মা তাদেরকে উদ্ধার করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা হলো – খুটামারা ইউনিয়নের খালিশা, খুটামারা গ্রামের টনে মামুদের স্ত্রী শাহী, টাটারি স্ত্রী ছারা, শাহারা, সুলতানের স্ত্রী আকলী,

রবিউলের স্ত্রী নার্গিস, মৃত কলেজের স্ত্রী অহেদা, লবদ্দিনের স্ত্রী হাওয়া, বিশাদুর স্ত্রী হাওয়াতোন, বকশের স্ত্রী মজিলা, ওসমানের স্ত্রী আসমা, রশিদুলের স্ত্রী ক্যান্টি, ভালের স্ত্রী এপাতন, মৃত টোলার স্ত্রী রহিমা বেগম ও পাদুরার ছেলে লবদ্দিন, মৃত জমালার ছেলে রমজান (ভালে)।

৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

নয়া দিগন্তের ২৭ মে ২০১০ ইং তারিখের একটি পেপার কাটিং এখানে তুলে ধরা হলোঃ

সাইফুল মাহমুদ, ময়মনসিংহ প্রতিনিধিঃ .... প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় একজন বিদেশী ধর্মযাজকসহ তিন ধর্মযাজক ও তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালককে আটক করে পুলিশ। এ সময় ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত নারী ও পুরুষেরা জানান, সরিষাবাড়ী উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আবদুল বারেকের পুত্র রফিকুল, মাজারিয়া গ্রামের রফিক (পিতা – অজ্ঞাত) ও কাশেমের পুত্র রিপন এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার বাসনিয়োগী গ্রামের আসেক আলীর পুত্র শামসু, তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার কথা বলে। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের বলা হচ্ছে যে, ঋণ নেওয়ার জন্য সবাইকে ময়মনসিংহে যেতে হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে তাদের সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা এলাকায় জড়ো করা হয়। সেখান থেকে তাদের একটি বাসযোগে ময়মনসিংহে নিয়ে আসা হয়। দুপুর নাগাদ বাসটি শহরের ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজের কাছে পৌঁছে। এখানে একজন বিদেশীসহ তিন ব্যক্তি তাদের বাস থেকে নামিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নিয়ে যান। এদের মধ্যে কয়েকজনকে নদের পানিতে গোসল করায় আর তাদের জিজ্ঞেস করে – তোমরা কি যীশুকে বিশ্বাস করো ? এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই জানতে চান, ঋণ নিতে হলে যীশুকে বিশ্বাস করতে হবে কেন ? তখন শামসু তাদেরকে চুপ থাকার কথা বলে ধমক দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ পিছু হটতে থাকে। এ সময় নদের তীরে একজন মওলানাকে দেখে ঋণ প্রত্যাশীরা জানতে চান, ঋণ নেওয়ার সাথে যীশুকে বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি ? তখন হুজুর তাদের কথা শুনে বিষয়টি বুঝতে পারেন আর স্থানীয় লোকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। এ সময় বেশ কিছু

লোক জড়ো হয়। তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে কোতোয়ালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইউনাইটেড পেন্টিকেস্টল চার্চ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) ফাদার রেভা সমর সাংমা ও ফাদার রেভা প্রদীপ সাংমাসহ তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালক শামসু ও রফিকুলকে আটক করে। এ সময় ৩৫ নারী ও ২০ পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। তাদের সাথে ১৫ শিশুও রয়েছে। তারা সবাই মুসলিম দরিদ্র পরিবারের লোক।

এ দিকে ইউনাইটেড পেন্টি কেস্টল চার্চ অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) আমেরিকান নাগরিক ফাদার রেভা জেমস অরভিন নয়াদিগন্তকে জানান, আমরা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করি না। আমাদের কোন এনজিও নেই। আমরা কাউকে ঋণ প্রদানও করি না, আমরা তাদেরকে টাকা দেওয়ার কথাও বলিনি। তবে তিনি আগতদের কাছে জানতে চান, তারা যীশুকে বিশ্বাস করে কিনা, তার ব্যাপটিস্ট তরীকা কিনা। তখন জবাবে তারা বলেছেন, হ্যা, এ কথা বলার পরই তাদের গোসল করতে বলা হয়। কেন গোসল করতে বলা হলো ? এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি। তিনি বাংলায় আরো বলেন, আমার মন খুব খারাপ। ওরা অ্যাকশন নিবে, এসব আমার অপছন্দ।

খৃষ্টান মিশনারিরা ছলচাতুরি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে করে যাচ্ছে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের কয়েকজন

(১) ড. উইলিয়াম কেরীঃ তিনি পি.এইচ.ডি. হোল্ডার। তিনি পশ্চিম বাংলায় কৃষি কাজ করেছেন। তার ভাষা ইংরেজি, তিনি এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেন। তিনি দেখলেন, বাংলা ভাষা কোন সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। এটাকে ইংরেজি ভাষার সাথে মিলিয়ে একই ফর্মে একটি উন্নত ভাষা করা যায়। তিনি বহু বছর সাধনা করে এ বাংলাকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করেন। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে তার অবদান অনস্বীকার্য। তারপর তিনি কলকাতায় সুপিরিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হোন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রচার। তখন বাংলা বর্ণের কোন ছাপাখানা ভারতবর্ষে ছিল না। তিনি ইংল্যান্ডে অর্ডার দিয়ে বাংলা

বর্ণের ছাপামেশিন নিয়ে আসেন আর বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপান। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজি বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করে ভারতবাসীর মধ্যে বিলি করেন। এমন ত্যাগ যদি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে থাকতো, তাহলে আমাদের এতো দুর্দশায় পড়তে হতো না।

(২) মাদার তেরেসাঃ তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ এতিমখানা রয়েছে। মাদার তেরেসার এক বড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

এ ছাড়াও ড. টমাস, ফাদার টর্সবার্লার, টর্বেন্ডে পিটারসন, আলফ্রেড বরীন মণ্ডল, ড. অলসন – খৃষ্টান মিশনারির এ সকল নেতারা বছরের পর বছর ধরে বাংলার এ দুর্গম পাহাড়ের ভিতরে জীবন যাপন করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। আমরা ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের জন্য যেভাবে নিবেদিত পেয়েছি, এই খৃষ্টান নেতাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তার চেয়ে খুব বেশী না হলেও কম ছিল না। আমাদের ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের ঐতিহ্য খৃষ্টানরা নিয়ে গেছে।

সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি ?

পৃথিবীর পথে-ঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের আর রাস্তার ধারে অবহেলিত জারজ সন্তানদের তারা পিকাপে করে নিয়ে যায় তাদের সেন্টারে। এ শিশুদের মেধাবীদেরকে তারা শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ডাক্তার, পাইলট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাঁধলে এদেরকে ব্যবহার করে। যেমন বর্তমানে আফগান, ইরাকে যুদ্ধরত বহু আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য মারা পড়ছে কিন্তু এদের অনেকের জন্য চোখের পানি ফেলার মতো কোন আপনজন পাওয়া যায় না, কারণ এদের অধিকাংশই পথের ধারের অবহেলিত পরিচয়হীন জারজ সন্তান।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট

খৃষ্টান মিশনারি প্রেরক সমিতির সভাপতি বলেন, খৃষ্টান মিশনারিদের বড় উদ্দেশ্য, যে সব ছাত্র আমাদের স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপন করে বের হচ্ছে, তাদের মন মস্তিষ্ক আমাদের ধাঁচে গড়ে তোলা। (আপনি ঢাকায় বা বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে দেখবেন একটি স্কুলে ছাত্র দেওয়ার চেয়ে অভিভাবকরা বেশী খুশী হোন মিশন বা গির্জা স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করতে পেরে। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, ইংরেজি বলতে পারবে, স্মার্ট হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগ পাবে, বহির্বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার

জন্য যেতে পারবে।) তিনি বলেছেন, কোন গির্জা স্কুলে যদি কোন মুসলমান ছেলে পড়ে তাহলে আমাদের লাভ। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। জুমআয় যাবে, ঈদের নামায পড়বে, মা-বাবা মারা গেলে জানাযায় যাবে কিন্তু মন-মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইসলাম বিমুখ হবে। ইসলামের পক্ষে সে কথা বলবে না। বরং সে নিজের অজ্ঞাতে আমাদের মিশনারিগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের কথার প্রতিফলনের বহু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

আপনি দেখবেন, পৃথিবীর যেখানে খৃষ্টান মিশনারিগুলোর স্কুল আছে, সেখানে গির্জাও আছে। গির্জা ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও তাদের স্কুল কলেজ গড়ে উঠেনি, এমনকি লন্ডন ইউনিভার্সিটিও না। তার পাশে রয়েছে ভেস্টওয়ান খ্রিস্টিয়ান চার্চ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা যদি যদি কোন স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির পাশে মসজিদ বানাতে চাই, তখন আমাদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করা হয়। আপনি নটরডেমে যান কিংবা মোহাম্মদপুরে আসাদগেট মিশনারি স্কুলে, সাথেই গির্জা দেখতে পাবেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের স্কুলে যদি তাকে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আমাদের মিশনারির বিপক্ষে একটি টু শব্দও করবে না।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হয়

দৈনিক নয়া দিগন্তের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খৃষ্টের বই, যীশু খৃষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ায়। ছোটদেরকে “সিবগাতুল্লাহ” নামের একটি বই পড়ানো হয় যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্টের একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে “ইটালি ডে জারি”র লেখা “আমার বাইবেলের বন্ধুগণ” পড়ানো হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উক্তি

হালুয়াঘাটে সফরকালে এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো। তিনি বলেন, আমার ছেলে মিশনারি স্কুলে বাইবেলও পড়ে। কথাটা খুব গর্বের সাথে বলছিলেন।

সমিতির মাধ্যমে প্রচার

খৃষ্টান মিশনারিগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে পুরুষ-মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল, বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশুখৃষ্টের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইনজিল শরীফ, মানে বাইবেল। লুকের লেখা "হযরত ঈসা মসীহ" আর "মুসলমান ও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী আর খৃষ্টানরা ১০০ ভাগ জান্নাতি" সহ আরো কতো বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু ও মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি।

"আগাবে" নামক একটি সমিতিতে সপ্তাহে ২ টাকা জমা নেওয়া হয় এ বলে যে, যখন এক হাজার টাকা জমা হবে, তখন তাদেরকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ রকম লোভ দেখিয়ে তারা দরিদ্রদের হাত করছে। একজনকে ১৮ হাজার টাকার চাকরি দেওয়া হবে বলে খৃষ্টান বানিয়েছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খৃষ্টান লাইফ অফ বাংলাদেশ (সি.এল.বি.) 'র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্যমতে, ১২ ই জুন ৪৫ জন মুসলমান ও ১৩ ই জুন ৫৬ জন হিন্দুকে শিশাতলী গির্জায় নিয়ে খৃষ্টান বানানো হয়েছে।

নীলফামারী জেলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার

নীলফামারী জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে ৩০০ গজ দূরে উকিলপাড়ায় অবস্থিত ইউনাইটেড পেন্টিকস্টাল চার্চ অফ বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটির আঞ্চলিক সমন্বয়ক প্রফুল্ল কুমারের দেওয়া তথ্যমতে শুধুমাত্র গত এক বছরে এই জেলাতেই ৫৩৬ জন হিন্দু ও ৪৫ জন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানানো হয়েছে। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার বাইবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ে তার চাকরি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

নেত্রকোনা জেলায় ধর্মপ্রচার

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরসহ বিভিন্ন এলাকার গারোদের খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। নজরুল ইসলাম নামক প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া তথ্যমতে নেত্রকোনা জেলায় "মৌ" নামক স্থানে যাওয়ার পথে দুটো মুসলমান ইউনিয়ন খৃষ্টান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। অথচ সেখানে ৫ টি মাদরাসা রয়েছে।

মি. বুশের একটি ভাষণ

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের পূর্বে এক ভাষণ দেন যা ১৪ টি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন – ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালোকে সম্প্রসারণ এবং মন্দকে প্রতিহত করতে। তাই এই সরকার বাইবেলে প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং সারা বিশ্ববাসীকে গোলামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন – মানুষকে মুক্ত করার জন্য আসলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাপ নেই, মা নেই, আর যারা বিধবা, স্বামী নেই, তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে খৃষ্টানদের দাওয়াতি কাজ

দৈনিক ইনকিলাবের এক সাংবাদিক সাদেক হুসেন তার একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলেছেন, রাঙ্গামাটি থেকে দুই দিনের দূরত্বে ভারতের সীমানার কাছে একটি ইউনয়ন আছে "সাজেক"। এ এলাকায় ২০ হাজার মানুষ আছে যারা ইংরেজিতে কথা বলে। গিটার বাজিয়ে ইংরেজি গান গায় আর ছেলে-মেয়েরা জিন্স প্যান্ট পড়ে। ইউরোপীয় স্টাইলে তাদের জীবনধারা।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশিত একটি সূত্রমতে কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রভৃতি এনজিও দরিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উপজাতিরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সেখানে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড। আর এ কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোন ঘটনা ঘটলেই পাড়া-পড়শি জানার আগেই তা পৌঁছে যায় বিশ্বব্যাপী। ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ পৌঁছার আগেই ওয়াশিংটন, লন্ডন, টোকিও, ভ্যাটিকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিবৃতি আসতে থাকে।

জুমল্যান্ড পরিকল্পনা

একাধিক আন্তর্জাতিক খৃষ্টানসংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। মুসলিম রাজ্যের বুকে জুমল্যান্ড নামে একটি খৃষ্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় "পূর্ব তিমুর" নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডতুল্য খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনায়ময় এক দশমাংশ অঞ্চল তথা পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে

তাদের এ নয়া রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা। ৭ মে ২০০৬ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সন্তু লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে স্বাধীন জুমল্যান্ডের পরিকল্পনা থাকলেও মিশনারিদের টার্গেট ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো।

অবশ্য প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ মনে করেন, ইহুদি-খৃষ্টান বিশ্বের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এর সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ খৃষ্টরাষ্ট্রের জন্ম দিবে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে ঐ সব অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে একই ধরনের মিশনারিগোষ্ঠীর জোরালো কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মতে, এদের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে খৃষ্টানরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর প্রতিরক্ষাবলয় সৃষ্টি করা। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পার্বত্য এলাকা তথা মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মনিপুরে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় দেশীয় ও ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বিমুখী তৎপরতায় ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, যখন এ দুই পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাবে তখন সন্তু লারমা গং গণভোটের দাবী তুলবে। এদিকে ইহুদি-খৃষ্টানদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ গণভোটের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের স্বপ্নের স্বাধীন খৃষ্টরাষ্ট্র।

আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টাই, তাদের কাছে ইসলামের আমানত না পৌঁছে দেই, তাহলে আমাদেরও ভোগ করতে হবে পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের পরিণতি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে গরীব অসহায়দের চিকিৎসা সেবার নামে তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে খৃষ্টান বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তারা বাস্তবায়ন করে চলেছে। মিশনারিদের এই নিরন্তর সাধনায় তারা আদৌ ব্যর্থ হচ্ছে না।

খৃষ্টান বানানোর কৌশল

কৌশল ১ – যশোরে ফাতেমা নামক একটি হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন সে হাসপাতালে প্রায় ছয়শত মুসলমান চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে

আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। জনৈক রোগীর ঘটনা, সে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলো। কর্তব্যরত নার্স তাকে তাকে একটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, এটা আল্লাহ'র নাম নিয়ে খেয়ো। সরল মহিলা সেবিকার পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করলো বটে, কিন্তু রোগ সারলো না। পরদিন আবার গেলে তাকে আরেকটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, যীশুর নামে খেয়ে দেখো সারে কিনা। এবার ঔষধ সেবনে তার রোগ সারলো। (মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ঔষধ দিয়েছিলো) এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে দেশের সরলপ্রাণ আত্মভোলা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে মিশনারিরা।

কৌশল ২ – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালোবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)। উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বললো – বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন – তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনই খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহ'র পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ'র বান্দা ও দাস। এখন বলো, পুত্র হিসেবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'কে ?

কৌশল ৩ – খৃষ্টানরা পরিকল্পিতভাবে খৃষ্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী, ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেওয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে ঈমান হিসেবে ঈমানে মুসাসসালের অংশবিশেষ "নবীদের উপর ঈমান আনয়ন" এর আবশ্যকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। এ ধরেনর প্রচারণার শিকার দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার আমীর হামযা সম্পর্কে জানা যায়, সে নিজেলে

ঈসায়ী মুসলমান হিসেবে দাবী করে। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে "ঈমানে মুফাসসাল" কালেমার বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তি দেখায় যে, এতে পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং তা আবশ্যক, সে নিরিখে সে ঈসায়ী মুসলমান। এ সব ঘটনা বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য যে কৌশলেরই প্রয়োজন দেখা দিক, সুচতুরভাবে তা প্রয়োগে তার সদা তৎপর থাকে।

কৌশল ৪ – মুসলিমুদ্দিন সানোয়ার নামে এক যুবককে (যিনি খৃষ্টানদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। সানোয়ার বললেন, আমি দুইবার মিশনারির প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। প্রথমবার শিকার হয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে। বই পাঠে আমার প্রচণ্ড লোভ ছিল। একদিন একটি বইয়ে "পোস্ট বক্স নং" সংযুক্ত একটি ঠিকানা পেলাম। বইটি ছিল খৃষ্টান মিশনারির প্রকাশিত। আগে শুনেছি, খৃষ্টানদের চিঠি-পত্র লিখলে তারা প্রচুর বই পাঠায়। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই ঠিকানা অনুযায়ী পত্র লিখলাম। এর কিছুদিন পরই ডাক মারফত আমার ঠিকানায় বই আসলো, সাথে একটি প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্রটি দেখে বুঝলাম, বইগুলো পড়ে উত্তর দিতে হবে। হাতে সময় মাত্র সাত দিন। অনেক খুঁজাখুঁজির পর উত্তরগুলো লিখে পাঠালাম। পরবর্তীতে তারা আমার কাছে ডাকে আরো কিছু বই ও প্রশ্নপত্র পাঠালো। তখন আমি এইচ.এস.সি. ১ম বর্ষের ছাত্র। উত্তর লিখে নির্ধারিত বক্স নাম্বারে পাঠানোর পর তারা আবার এক সেট বই, প্রশ্নপত্র, নাম্বার ও সনদপত্র পাঠালো।

তৃতীয়বারের প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন দেখে একটু বিব্রতবোধ করলাম। প্রশ্নটি ছিল এরূপ – আপনি কি যীশুকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করেন ? আমি জানতাম, এ প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যা বলি, তাহলে আরো বই আসবে, অন্যথায় বই পাঠানোর এ ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানের দাবীকেই আমি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে "না" লিখে পাঠালাম।

কৌশল ৫ – সেই সানোয়ার দ্বিতীয়বার মিশনারির শিকার হলেন। সানোয়ার বলেন, আমি চাকরি পাওয়ার জন্য একদিন ঢাকায় ১০৫/১৬ মনিপুরী পাড়ায় সিএলবি অফিসের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। পরিচয়পর্বের পর সেখানের এক কর্মকর্তা আমাকে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বেশ ধারণা দিতে লাগলো এবং বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে তার উক্তিগুলোর যুক্তি দিতে লাগলো। আমি নীরবে তার কথার সায় দিচ্ছিলাম। তার কথার সারমর্ম ছিল, যীশুই এ পৃথিবীর একমাত্র অভিভাবক। যীশুকে ছাড়া আল্লাহ'কে পাওয়া কোনভাবেই

সম্ভব নয়। আমার ইতিবাচক অবস্থাদৃষ্টে "ধর্মান্তর করা যাবে" মর্মে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। সেদিন অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে ২১/২২ মার্চ ১৯৯৯ ইং সালে ট্রেনিংয়ে যোগদানের জরুরী আহবান জানিয়ে বিদায় নিলো। সম্ভবত ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সালের ঘটনা – একজন ফাদার আমাকে খৃস্টধর্মের বড়ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ বুঝান। এরপর ধ্যানের আসনে বসিয়ে একটি বই থেকে কিছু পড়ালো, তখন আমার চোখ বন্ধ ছিলো। পড়া শেষে আমাকে বলা হলো, আপনি খৃষ্টান হয়ে গেছেন। এরপর খৃষ্টধর্মের স্বার্থকতা ও ইসলামধর্মের অসারতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। এক পর্যায়ে আমাকে বললো – মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তি হিসেবে একজন সাধারণ মানুষ, ইসলামধর্মে তার কৃতিত্ব নেই। একমাত্র যীশুই সমস্ত কিছুর অধিকারী। যীশুর জন্ম না হলে এ পৃথিবীর জন্ম হতো না।

কৌশল ৬ – মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার একটি বড় কৌশল হলো, মিশনারিতে ধর্মান্তরিত হলেও নাম রাখে মুসলমানদের, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না পারে। যেমন, যশোর জেলায় ফাতেমা হাসপাতাল নামে একটি মিশনারি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরে খোদিত সুন্দর একটি সিনারী আঁকা, এতে মাদার তেরেসার সদলবলে একটি সাঁকো পার হওয়ার দৃশ্য। ছবির নিচে সুন্দর করে লেখা – যীশু পীড়িত মানুষকে সেবাদানের জন্য এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ছবিটি হাসপাতালের প্রবেশ পথের সামনের দেওয়ালে এমনভাবে সাঁটানো যে, যে কোন দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতা লোকের নজর কাড়ে। হাসপাতালের গেটম্যানের নাম মুহাম্মাদ সৈয়দ, মূলত এই লোকটি খৃষ্টান। তদ্রূপ হাসপাতালের এম. ডি. ও প্রধান ডাক্তারসহ প্রায় সবাই খৃষ্টান হলেও মুসলিম নাম ধারণ করেছে। যেমন, এম. ডি.র নাম মুহাম্মাদ বোখারী।

এই হাসপাতালের পিছনে একটি গির্জা আছে। গির্জা ও হাসপাতালের মাঝামাঝি একটি পার্ক আছে। এ পার্কে টিলার উপর কৃত্রিমভাবে নির্মিত বিশাল আকারের একটি নারীমূর্তি। এর সামনে কয়েকটি নারীমূর্তির হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য। কয়েকটি ভেড়া হা করে চেয়ে আছে বিশাল নারী মূর্তিটির দিকে। এর মধ্যে একটি ভেড়া অলস ঝিমুচ্ছে। রোগী ও দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলোর লীলা উপভোগ করছে। রোগীদের একঘেয়েমী দূর ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ ব্যবস্থা। পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয় – এগুলো গির্জার মহিমা ফেরি করে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। সে পার্কে মিশনারির নিযুক্ত লোক দর্শনার্থী ও রোগীদের কাছে মূর্তিগুলোর

অবস্থা বিশ্লেষণ করে মেরীর মহিমা প্রচার করে। যেমন, দর্শনার্থীদের বা রোগীদের বুঝায় যে, টিলার বড় নারী মূর্তিটি হলো মেরী, যাকে মরিয়ম বলা হয়। আর প্রণামরত ছোট ছোট নারী মূর্তিগুলো হলো স্বর্গীয় দূত, যাদেরকে আপনারা ফেরেশতা বলেন। অর্থাৎ, মেরী কোন একসময় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গীয় দূতেরা তাকে দেখে প্রণাম করছে আর ভেড়াগুলো ঘাস খাওয়া বিরতি দিয়ে মেরীকে দেখছে। একটি ভেড়া বেখেয়ালে ঝিমুচ্ছে। স্থানীয় একজন আলিম জানান, রোগীদের পার্কে ঘুরানোর সময় গির্জার নিযুক্ত লোকেরা চাতুর্যের সাথে মেরীর মূর্তি ও গির্জার প্রতি ভক্তিমূলক ইঙ্গিত-ইশারা করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ তোলে। আর হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটানো যীশুর ছবি, সাঁকো পার হওয়া সংবলিত আর্ট, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশুর রোগীসেবা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগীর বেডের আশেপাশে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়, যেন অবসর সময়ে রোগী নিজ থেকে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবে সেখানে লোকজনকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী

১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরাজ গ্রামে দুইজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রধান আতাউর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় ধর্ষিতারা জানান, গত ১লা আগস্ট প্রশিক্ষণের নামে ৯ জন মহিলাকে গ্রামের অফিস লক্ষ্মীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত যাপনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একটি কক্ষে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। রাত আনুমানিক ১ টার দিকে প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অনুখুল ও মহিলা কর্মচারী লায়লা খাতুন তাদেরকে জানায়, বড় সাহেব তোমাদের সাক্ষাৎকার নিবেন। তারপর একজন একজন করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন লোক তাদেরকে রাতভর ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকে পরদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত ঐ ঘরে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘটনাটি ফাঁস না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখানো হয়। পড়ে মহিলারা গ্রামে ফিরে নিজ নিজ অভিভাবককে জানালে এবং

লোকমুখে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে। সেদিন থেকে এ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তথ্যপঞ্জি – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক করতোয়া, ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, দেশ জগত।

এ ধরনের বহু ঘটনা গ্রামবাংলায় ঘটছে। কোনটা পত্রিকার খবর হয়, আবার কোনটা হয় না। অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে এনজিওদের বর্বরতা চাপা দিয়ে রাখে।

দাওয়াতি কার্যক্রম

আজ খৃষ্টান মিশনারিরা নিষ্ঠার সাথে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আহবায়িত মানুষ হলো মুসলমান। তাই মুসলমানদের কাছে তাদের মিথ্যা দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তাই তো দেখা যায় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, অফিস-আদালতে তাদের দাওয়াত চলছে। এমনকি আমাদের মসজিদেও তাদের দাওয়াত চলছে।

আজ থেকে বছর খানেক আগের কথা। আমি তখন মধ্য বাড্ডায় নৈশ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। একদিন সকালে আমার এক ছাত্র এসে বললো, কে যেন একটি ইনজিল শরীফ রেখে গেছে। এভাবেই চলছে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম।

স্কুল-কলেজে তাদের দাওয়াত চলছে হ্যান্ডবিল ও বই-পত্রের মাধ্যমে। সেমিনারের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, ঈসায়ী ধর্মই হচ্ছে গুনাহ থেকে মুক্তির একমাত্র সহজ পথ। কিন্তু আমরা কয়জন অমুসলিমকে দাওয়াত দেই ? কয়জন হিন্দুকে ইসলামের কথা বলি ? কয়জন খৃষ্টানকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বলি ? খৃষ্টানরা তো জীবন বাজী রেখে আমেরিকা, ইতালি ও লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসে ধর্মপ্রচার করতে। তারা চলে যাওয়ার জন্য আসে না, এদেশেই তাদের অন্তিম সমাধি হয়। তার ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। এখানে একটিমাত্র উল্লেখ করছি।

ফাদার হুমরিক নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত কর্মরত। তার প্রচেষ্টায় ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে। আর আমি আপনি কয়জন অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পেরেছি ? এ দেশে তো কোন মুসলমান ছিল না। আমরা মুসলমান হয়েছি কিভাবে ? আমাদের আকাবিরগণ এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচার করার জন্য, তারা প্রচার করে চলে যাননি। দেখুন, সিলেটে শাহজালাল

ইয়ামানী, খান জাহান আলী, কারামত আলী জৈনপুরী প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন আমৃত্যু এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম নেতাদের চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। আপনিও সেই সুন্নাত আদায়ের লক্ষ্যে দেশের অমুসলিম এম.পি. মন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতে পারেন। আপনার চিঠিটা পাওয়া তাদের হক।

ভেবে দেখুন, কিছু করতে পারেন কিনা।

করণীয়

খৃষ্টান মিশনারির ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরলপথ হারিয়ে জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে মুসলিম মনন-মস্তিস্ককে খৃষ্টবাদের ছাঁচে নেওয়ার কৌশল করছে। এমতাবস্থায় প্রিয় ছাত্রভাইদের কর্তব্য, মিশনারিগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খৃষ্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা এবং তাদের অপতৎপরতার গতিকে রুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে –

(১) মিডিয়াঃ মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

(২) রাজনীতিবিদদের সতর্ক করাঃ খৃষ্টান মিশনারিগুলো এ দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড নিজেদের দখলে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তারা নেতাদের কাছে উপঢৌকন ও উপহার পেশ করে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং অর্থ-কড়ির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলের জোর তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। এর উৎকৃষ্ট নজির জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বিরোধী রায় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে আমাদের উচিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তা ও সব শ্রেণীর লোকদের উক্ত বিষয়ে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করা।

(৩) লেখালেখিঃ আজ লেখালেখি ও প্রকাশনার দিক দিয়েও তারা পিছিয়ে নেই বরং একধাপ এগিয়েই আছে। খৃষ্টান মিশনারিগুলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই লিখে

প্রচার করছে। তার মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি – “গুনাহগারদের জন্য বেহেশতের পথ” (এই নামটির শুরুতে আরবিতে লেখা – “ত্বারিকুল জান্নাতি লিল মুযনিবি”), বেলালের লেখা “আপনার জন্য আমার অন্তরের কথা”, “গুনাহ থেকে মুক্তির পথ”, “কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ” ইত্যাদি। এগুলো হলো মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা খৃষ্টানদের বই। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিংবা হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লেখা কয়টি বই আছে আমাদের ?

আমার ভাই, আমাকে একটি বই দেখান যে, এই বইটি খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে।

ভাই আমার, উঠুন, জাগুন, প্রতিজ্ঞা করুন আর টার্গেট বানান যে, আপনিও কিছু লিখবেন। অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে লিখবেন আর তাদের কাছে প্রচার করবেন। (নোটঃ এ বিষয়ে বেশ কিছু আলিমের লিখিত বই রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম একটি বইয়ের নাম আর্টিকেলের শেষে উল্লেখ করা হলো) আজ তারা আমাদের দেশের লেখকদের কিনে নিয়েছে আর তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদটি বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছে এবং বড় বড় লেখকদের কলম থেকে তাদের মতবাদ ও দাওয়াত প্রচার করাচ্ছে। আমরা কি কখনো সেই কলামিস্টদের কাছে গিয়েছি ? ইসলামের হক্কানিয়াত তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি ? আমরা কি তাদের বুঝিয়েছি যে, আখিরাতের ফিকির করে, ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে আপনাকে ইসলামের পক্ষে লিখতে হবে ? উত্তর যদি “না” হয়, তাহলে তাদের কাছে কে যাবে ? কারা তাদেরকে বুঝাবে ? তাদের কাছে কি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আসমান থেকে কোন ফেরেশতা আসবে ? না বন্ধু, না। আমাকে-আপনাকেই যেতে হবে।

উঠুন বন্ধু, আর কতোদিন ঘুমিয়ে থাকবেন, ঘুমিয়ে থাকার আর সময় নেই।

উলামায়ে কেরামের করণীয়

উলামায়ে কেরাম হলেন ধর্মীয় অভিভাবক। আর ধর্মীয় অভিভাবকদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। ছকে বাঁধা দ্বীনি খেদমতে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের শান নয়। সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশকারী মিশনারি ও তাদের তাবেদার এনজিওদের অপতৎপরতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা তো তাদের ফরয কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লক্ষ কোটি উম্মত সমাজের মিশন-আখড়ায় বন্দী হয়ে খৃষ্টান জগতে পাচার হয়ে চিরতরে জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছে – এ

নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা থাকা প্রয়োজন। যারা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অহর্নিশ মানবেতর জীবন যাপন করছে, যাদের রোগে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই, তাদের পাশে দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে উঠা আজ সময়ের দাবী।

কতো ভালো হতো, যদি উলামায়ে কেরাম নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হতেন –

(১) সরাসরি খৃষ্টানদের দাওয়াত দেওয়া, বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মের প্রচারক।

(২) ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি স্কুলের মোকাবেলায় মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল কায়েম করা।

(৩) ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

(৪) অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের করণীয়

আল্লাহ আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করার জন্য। আজ খৃষ্টানরা যদি তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সত্য ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতে পারবো না। আমাদের তো বরং দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

চট্টগ্রামের উলামায়ে কেরামদের প্রতি আমার আবেদন

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এই অঞ্চলকে "মাদখালুল ইসলাম" বা ইসলামের প্রবেশ পথ বলা হয়। এই পার্বত্য এলাকায় বাস করে ৪৫ টি জাতি গোষ্ঠীর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এতো কাছে হওয়া সত্ত্বেও বিশাল এই হিল বেল্টে আমরা ইসলামের আলো পৌঁছাতে পারিনি। অথচ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে খৃষ্টান মিশনারিগুলো এদেশে এসে পাহাড়ের ভিতরে জঙ্গলের গভীরে গিয়ে এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম ইত্যাদি উপজাতির হাজার হাজার মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে। সেখানে মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে খৃষ্টানদের গির্জা তৈরি হয়েছে। কি আশ্চর্য! চট্টগ্রামের মুসলমান যারা দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে পরিচিত তাদের চোখের সামনেই উপজাতি ভাইদেরকে – যাদের

কোন ধর্ম নেই, মিশনারিরা খৃষ্টান বানিয়ে ফেলছে। বলতে হবে, এটা আমাদের ব্যর্থতা। পাহাড়ের ভিতর খৃষ্টানরা স্কুল বানিয়ে, ঘর নির্মাণ করে, খাদ্য দিয়ে তাদেরকে বিনামূল্যে অন্ন, শিক্ষা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা মাদ্রাসা ঘেঁষে আরেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছি, কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে কোনদিন একটি মাদ্রাসা বানানোর উদ্যোগ নেইনি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ফিকির নিয়ে এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন, আমীন।

মাওলানা মুফতী যুবায়ের
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ
সূত্রঃ পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি

আর্টিকেলটি নেওয়া হয়েছে এই বই থেকে – মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল

উপসংহার

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الۡكٰفِرِيۡنَ وَاَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيۡرًا ۙ

আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।—আল আহ্যাব - ৬৪

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوۡنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا ۚ

সেখানে এরা স্থায়ী হবে এবং এরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেন —আল আহ্যাব - ৬৫

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوۡهُهُمۡ فِى النَّارِ يَقُوۡلُوۡنَ يٰلَيۡتَنَاۤ اَطَعۡنَا اللّٰهَ وَاَطَعۡنَا الرَّسُوۡلَا

যেদিন এদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হবে সেদিন এরা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! —আল আহ্যাব - ৬৬

وَقَالُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوۡنَا السَّبِيۡلَا

তারা আরও বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের আনুগত্য করেছিলাম এবং এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল ;
—আল আহ্‌যাব - ৬৭

رَبَّنَآ اٰتِہِمۡ ضِعۡفَیۡنِ مِنَ الۡعَذَابِ وَالۡعَنۡہُمۡ لَعۡنًا کَبِیۡرًا ٪

‘হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং এদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত।’ —আল আহ্‌যাব - ৬৮

হটকারিতা, জিদ ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির জন্য সেই ধর্মকে বাছাই করি, যা মহান আলাহ সকল মানুষের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম।"

উপসংহার

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ভুল বোঝাবুঝি এবং ষড়যন্ত্র একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের দায়িত্ব হলো জ্ঞানের আলোকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক বার্তা তুলে ধরা।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নীতিকে সামনে রেখে মুসলিমদের নিজস্ব চরিত্র উন্নয়ন এবং দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে বিভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ یَقُوۡمُ الۡحِسَاب ٪

‘হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু’মিনগণকে ক্ষমা কর।—ইব্রাহীম - ৪১

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“রাব্বানা লা তাজ্‌আলনাফিতনাতাল লিলক্বাউমিযা-লিমীন।অনাজ্জিনাবিরহামাতিকা মিনাল ক্বাউমিল কা-ফিরীন।”

অর্থঃহে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না। আর তুমি তোমার নিজ করুণায় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।” (ইউনুসঃ ৮৫-৮৬)।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“রাব্বানা লা তাজআলনা ফিতনাতাল লিল্লাযীনা কাফারু, অগফির লানা রাব্বানা, ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।”

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (মুমতাহিনাহঃ ৫)

সহায়ক পুস্তক

১.সংক্ষেপিত ইযহারুল হক, কিতাবুল মোকাদ্দাস ইঞ্জিল শরীফ ও ইসাই ধর্ম

ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

২.মুসলিম বিশ্বে ইহুদি খ্রিস্টানদের মরন ছোবল

মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী

৩.অবাধ্যতার ইতিহাস

ডাক্তার শামসুল আরেফিন

৪.**শিকড়ের সন্ধানে**

হামিদা মোবাশ্বরা